শুকতারা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা
চৈত্র •• ১৩৭৯

রহস্যময় অভিযাত্রী

রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষা। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী— সবাই রয়েছেন আসরে। বিদুর ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীকে।

অর্জুন অনেক খেলা দেখালেন। অবাক-করা নানা কৌশল। এমন সময় হঠাৎ কর্ণ এসে হাজির। কর্ণও সবই দেখালেন। অর্জুন আর কর্ণের মধ্যে লড়াইয়ের উপক্রম। শেষ পর্যন্ত অর্জুন অচেনা-ঘরের ছেলের সংগে লড়তে রাজী হলেন না অবশ্য।

অমৃত সমান মহাভারত-কথা

বোরোলীন হাউস কর্তৃক প্রচারিত

দুর্যোধন কিন্তু আগাগোড়া কর্ণের পক্ষে। তিনি কর্ণকে একটা ছোটখাটো রাজ্যই দিয়ে দিলেন। দু'জনে সেই থেকে বন্ধুত্ব। কর্ণ রাজা হয়েছেন দেখে কুন্তী খুবই খুশী। তাঁরই ছেলে তো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

বোরোলীন
সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ্ম-শুষ্ক,
কিংবা ঝলসানো ত্বকের
অনবদ্য নিরামায়—।

(চলবে)

বাঁটুল দি গ্রেট

দেখি এই কাজটা যদি করতে পারা যায়!
পশুপালনে অভিজ্ঞ কর্মী চাই।
কাজটা আমি ভালোভাবেই করতে পারবো!
বাপরে গেছি!
হুম! এই ব্যাটাই ঘুস নেওয়ার জন্যে আমাকে একবার জেল খাটিয়েছিল! আজ দেখাচ্ছি মজা!
ঠিক আছে, তবে দক্ষতা হিসেবে তোমাকে এই ছাগলটার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে। ভারী ভালো মেজাজের এটা! 'মুনিয়া' বলে ডাকলেই কাছে আসে।
বাঃ, এ তো খুব ভালো ছাগল! আয় রে মুনিয়া আয়!
হাঃ হাঃ! মুনিয়া বলে ডাকাতে এর আগে পাঁচজনকে গুঁতিয়ে ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে!
আবার মুনিয়া! দাঁড়াও, দিচ্ছি তুলো ধুনিয়া!
দড়াম!
মনে হচ্ছে ও আমার সঙ্গে মিতালি করতে রাজী নয়!
এটা খুব একটা ভুল হয়ে গেছে বাঁটুল! তুমি বরঞ্চ ওই গরুটা দুয়ে নিয়ে এসো!
ঠিক আছে, এখনি দুয়ে নিয়ে আসছি!
হোঃ হোঃ! ওটা মোটেই গরু নয়, একটা ষাঁড়! ছাগলটা যা পারে নি এটা তা পারবে!

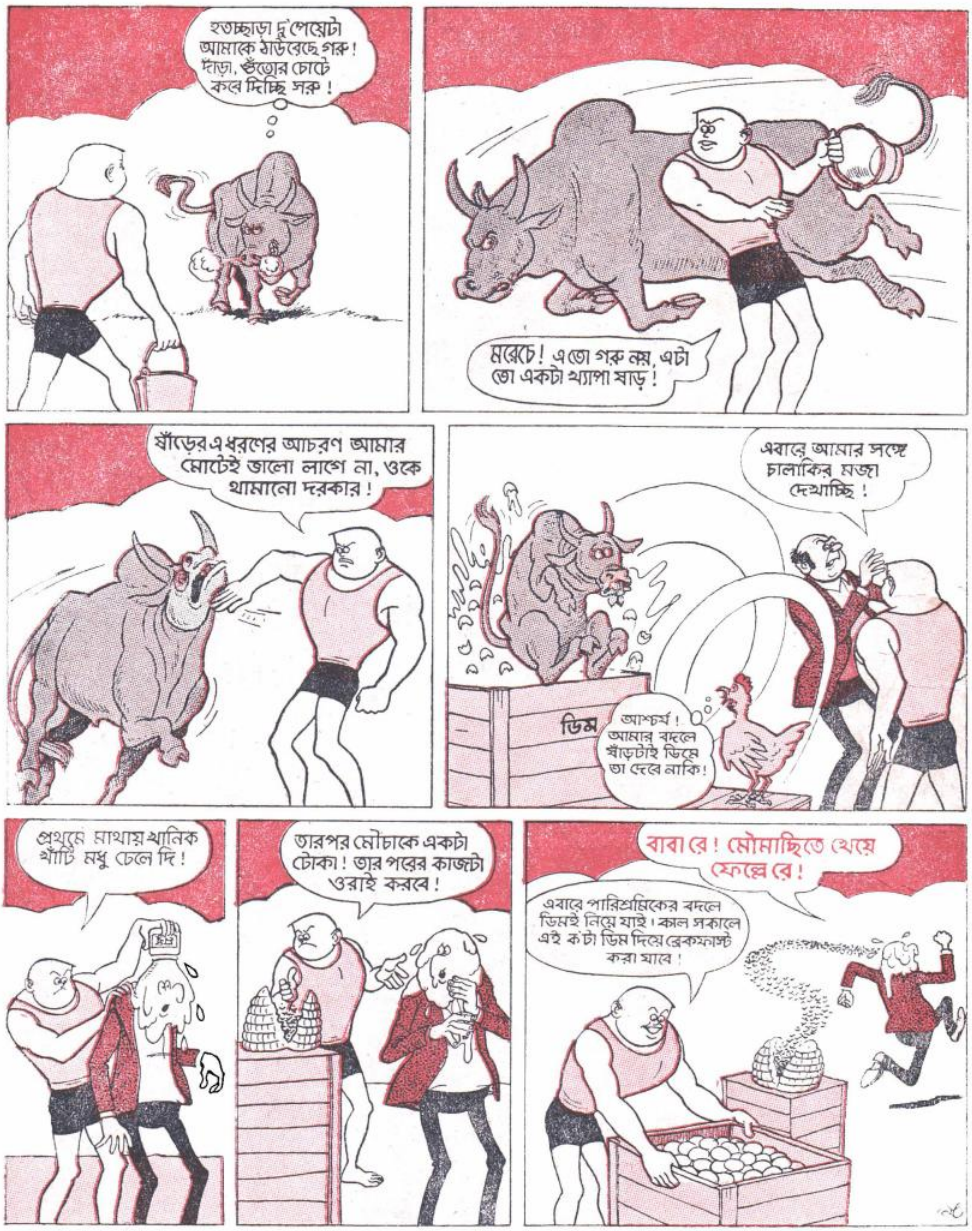
হতচ্ছাড়া দু'পেয়েটা আমাকে মারবেছে গরু! দাঁড়া, শুঁতোর চোটে কবে দিচ্ছি সরু!
মরেচে! এতো গরু নয়, এটা তো একটা খ্যাপা ষাড়!
ষাঁড়ের এধরণের আচরণ আমার মোটেই ভালো লাগে না, ওকে থামানো দরকার!
এবারে আমার সঙ্গে চালাকির মজা দেখাচ্ছি!
ডিম
আশ্চর্য! আমার বদলে ষাঁড়টাই ডিমে তা দেবে নাকি!
প্রথমে মাথায় খানিক খাঁটি মধু ঢেলে দি!
তারপর মৌচাকে একটা টোকা! তার পরের কাজটা ওরাই করবে!
বাবা রে! মৌমাছিতে খেয়ে ফেল্লে রে!
এবারে পারিশ্রমিকের বদলে ডিমই নিয়ে যাই। কাল সকালে এই কটা ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট করা যাবে!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭৯

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	রহস্যময় অভিযাত্রী ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	ঘোড়ার ডিম (কবিতা) ...	নয়নরঞ্জন বিশ্বাস ...	৭৯
৪।	রূপকথার ফুলঝুরি (গল্প) ...	কানাইলাল ভট্টাচার্য ...	৮১
৫।	বিশ্বাস হবে কি ? (জানবার কথা) ...	— ...	৮৯
৬।	বিলিতী ভূতচতুর্দ্দশী (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৯০
৭।	করতে পার (মজার ছবি) ...	— ...	১০১
৮।	বোকা হীরু (ছবিতে গল্প) ...	মৈত্রেয়ী মুখার্জী ...	১০২
৯।	মেডিনা (বিদেশী গল্প) ...	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ...	১০৬
১০।	নবসাজে শার্লক হোমস্ (গোয়েন্দা কাহিনী)	শৈলেশ ভড় ...	১১২
১১।	বিষ্যুদবারের গেরো !! (ভ্রমণ কাহিনী)	সবিতা ঘোষ ...	১১৭
১২।	'করতে পার' ছবির উত্তর ...	— ...	১২৫
১৩।	বিষুব রেখার অন্তরালে (ধারাবাহিক কাহিনী)	শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু ...	১২৬
১৪।	"৺শান্তনুকুমার পাল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	...	১৩২
১৫।	উৎকলকেশরী কপিলেন্দ্র (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	১৩৩
১৬।	করলে তোমরাও পার (জানবার কথা) ...	— ...	১৪১
১৭।	হাঁদা-ভোঁদার শূন্যে ডিগবাজী (ছবিতে গল্প) ...	— ...	১৪২
১৮।	অপরাধী (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	সন্তোষকুমার মালাকার ...	১৪৪
১৯।	রংয়ের মজা (মজার ছবি) ...	— ...	১৪৮
২০।	বোবা (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	সঞ্চয়িতা কোলে ...	১৪৯
২১।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	১৫৩

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

মজেভরা...মনেরমত...মজাদার

মাত্র ২৫ পয়সা!

নতুন **পার্লে**

পপিন্স

ফলের স্বাদেভরা লজেন্স

লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাস্পবেরী—
এই ৫টি ফলের স্বাদে ভরপুর কম দামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে
খুব সুস্বাদু ১৩ রকমের লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।

৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন

everest/122b/PP b

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : ২য় সংখ্যা : ১৩৭৯, চৈত্র

ঘোড়ার ডিম

নয়নরঞ্জন বিশ্বাস

ঘোড়ার ডিমে তা দিলে ভাই
হবে ঘোড়ার বাচ্চা
নয়কো এসব মিছে কথা
একেবারে সাচ্চা।
ঘটনাটা চোখেই দেখা
আজগুবি নয় সত্যি ;
খুলেই তবে বলছি শোন
নয় মিছে এক রত্তি।
পরশু দিনে হাটের মাঝে
ঘটনা এক ঘটে,
ঘটার পরেই খবরখানা
মুখে মুখেই রটে।

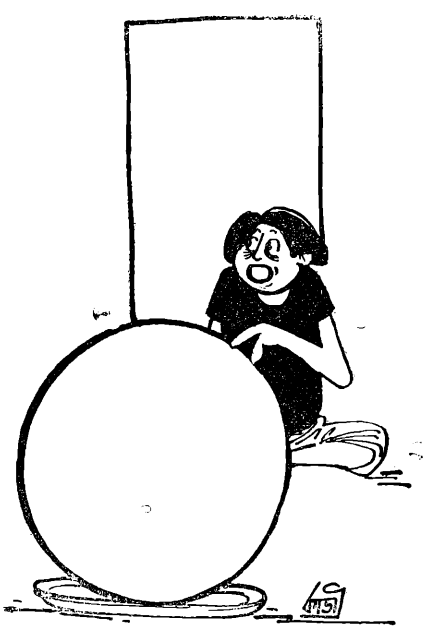

'হাটের মাঝে এনেছে কে
মস্ত ঘোড়ার ডিম,
দেশী ঘোড়ার ডিমটা দেখে
রক্ত হবে হিম।'
শুনেই মোরা চুলকে মাথা
হলাম সেথায় জড়,
দেখতে হবে এই মনে সাধ
ব্যাপার কেমনতর।
গিয়ে দেখি ডিমের উপর
পাঁচটি ঘোড়া বসে,
মনের সুখে পাল্লা দিয়ে
তা দিয়ে যায় কষে।
তা-এর চোটে ডিমটা ফুটে
বেরয় ঘোড়ার ছানা,
বেরিয়ে তার সয় না সবুর
খেল নানান খানা।
খানা খেয়ে আবার ঘোড়া
ডিমের ভেতর ঢোকে,
দেখতে মজা শীতের কালে
ঘামছে বেজায় লোকে।
ঘোড়ার ছানা ডিমে ঢুকে
হয় না তো আর বের,
পাঁচটি ঘোড়া তাই তো আবার
তা লাগাল ফের।

কিন্তু এবার ঘটল যেটা
শুনলে রক্ত হিম ;
ডিমটা ফুটে হাজার খানেক
বেরয় ঘোড়ার ডিম।

রূপকথার ফুলঝুরি

কানাইলাল ভট্টাচার্য

এইবার সাধুর তৃতীয় চেলাটি উঠে বলল, 'মহারাজ, ওরা দুজনে লোকালয় ঘুরে এল আমি কেন বাদ যাই! অনুমতি করুন আমিও একবার লোকালয় দেখে আসি।'

সাধুবাবা বললেন, 'বৎস, লোকালয়, নগর, শহর বড় রহস্যপূর্ণ স্থান। সেখানে দিবারাত্রি কত অঘটন সংঘটন হচ্ছে তার হিসাব নাই। তার প্রমাণ পেলে তো। তোমারই দুই শিষ্য ভাই কিছু দূর গিয়েই ফিরে আসতে বাধ্য হল। তোমরা সরলমতি সাধক ওসব বিষাক্ত আবহাওয়ার ভেতর প্রবেশ করতে চেষ্টা কর না।'

'সাধুবাবা, আপনারই মুখে শুনেছি দিল্লীতে একরকম লাড্ডু পাওয়া যায়—যে খায় সে-ও পস্তায়—আর যে না খায় সে-ও পস্তায়। তবে আমার মনে হয় না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানো ভাল।'

সাধু হেসে বললেন, 'তোমারও বড্ড ইচ্ছে হয়েছে লোকালয় দেখবার, বুঝতে পাচ্ছি। তবে তুমি যাবার আগে আমার মন্ত্রপূত কাষ্ঠদণ্ডটি নিয়ে যাও। এই দণ্ডটির দ্বারা তুমি অলৌকিক কাণ্ড করতে পারো এবং যদি বিশেষ বিপদে পড়ো, আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তো এই কাষ্ঠখণ্ডটি তিনবার মাটিতে ঠুকলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট পৌঁছে যাবো।'

লয়ে ভিক্ষার ঝুলি নির্ভয়ে তুলি চেলাটি হাসি মুখে রওনা হয়ে পড়ল। বন জঙ্গল নদ নদী পাহাড় পর্বত এক এক করে পেরিয়ে চলল। কোথায় লোকালয়! কোথায় সে

রহস্যপূর্ণ স্থান! শঙ্কিত মনে কৌতুকও অনুভব হতে লাগল। এই কাষ্ঠদণ্ড! কত অলৌকিক কাণ্ডই না এর দ্বারা সম্ভব হতে পারে।

অবশেষে সত্যই এক শহরে এসে প্রবেশ করল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। একটি ১৮ বৎসরের ব্যবসায়ী যুবক নিজের কাপড়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। চেলাটি তার সামনে উপস্থিত হয়ে বলল 'জয় হোক বৎস, 'কিছু ভোজন করাও। আমি ক্ষুধার্ত।' যুবক বলল, 'এখানে তো খাবার কোন ব্যবস্থা নেই, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, বাড়িতে আপনাকে ভোজন করাবো।'

চেলাটি সন্তুষ্ট হয়ে যুবকের সঙ্গে চলল। যুবক চেলাটিকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব যত্নসহকারে ভোজন করাল এবং চেলাটিও খুব পরিতোষ সহকারে ভোজন করল। পরে যুবকটি মাকে বলল, 'মা, তুমি ততক্ষণ আমার ভাত বাড়ো, আমি সাধুবাবাকে বাজারে পৌঁছে দিয়ে গঙ্গা থেকে নেয়ে এক্ষুণি আসছি।'

রাস্তায় যেতে যেতে চেলাটি যুবককে বলল, 'বেটা, তোর সেবায় আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি, তুই কি চাস বল আমি তোকে দোব।'

যুবকটি বলল, 'বাবা, আমার কোন জিনিসের অভাব নেই, আমি কি চাইব বলুন?'

'তবুও কিছু প্রার্থনা কর, আমি পূরণ করব।'

'আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই মহারাজ!'

'তবুও কিছু বল, আমি তোকে দোব।'

'কি আর চাইবো! আমাকে অলৌকিক কিছু দেখান।'

চেলা 'তথাস্তু' বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে চলল। সেখানে গিয়ে দেখল অনেকগুলি সাধু বসে খিচুড়ি রান্না করছে। চেলা বলল, 'বেটা ঐ গঙ্গার ঘাট থেকে নেয়ে আয়। ফিরে এসে এখানে খিচুড়ি খেয়ে যাবি।' এই বলে চেলাটি যুবকের মাথায় সেই মন্ত্রপূত কাষ্ঠদণ্ডটি ঠেকিয়ে দিল। যুবকটি গঙ্গায় ডুব দিল কিন্তু আর উঠল না।

ওখান থেকে কিছু দূরে আর একটি দেশে এক দম্পতি প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে এসে শিব পূজো করে। তাদের কোন সন্তানাদি নাই। প্রতিদিনই শিবঠাকুরের কাছে এই ভিক্ষা করে, 'বাবা, আমাদের ধনদৌলত অনেক দিয়েছ, সবই আপনার কৃপা। কিন্তু আমাদের সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত করেছ। বাবা, দয়া করো, আর কষ্ট দিও না— আমাদের একটি পুত্রসন্তান দাও।'

বাবা মহাদেব এতদিন বাদে তাদের কাতর প্রার্থনা শুনলেন। তাদের একটি পুত্র-সন্তান হল। এই যুবকটি যে ডুব দিয়ে আর উঠল না, সেই তাদের নিকট সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করল।

মহা আনন্দে ঐ দম্পতি পুত্রটি পালন করতে লাগল। ক্রমে ঐ বালকটি ১৮ বৎসরের যুবক হল। তারা ব্যবসায়ী লোক—ছেলেকে তাদের গদিতে বসিয়ে দিয়েছে। ছেলেও খুব ভালভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে।

'মা এই আঠারো বছর ধরে তুমি ভাত বাড়ছ ?' [পৃষ্ঠা ৮৪

একদিন সেই চেলা ঘুরতে ঘুরতে সেই দেশে গেল এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যখন ঐ যুবকটি দোকান বন্ধ করে মধ্যাহ্নে ভোজনের জন্য বাড়ি ফিরছিল সেই সময় ঐ চেলাটি বলল, 'বেটা আমি ক্ষুধার্ত আমায় কিছু ভোজন করাও।' যুবকটি বলল, 'বাবা এখানে তো ভোজনের কোন ব্যবস্থা নেই, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, বাড়িতে আপনাকে ভোজন করাবো।' চেলাটি সঙ্গে চলল। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেই যুবক তাঁকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করালো। আসবার সময় যুবকটি তার মাকে বলে এল, 'মা, তুমি ততক্ষণ আমার ভাত বাড়ো, আমি সাধুকে বাজার পৌঁছে দিয়ে, গঙ্গার থেকে একটা ডুব দিয়ে এক্ষুণি আসছি।'

এই বলে যুবকটি চেলার সঙ্গে চলল বাজারের দিকে। পথে যেতে যেতে চেলাটি বলল, 'বেটা তোর সেবায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুই কি চাস বল।'

'আমার কোন জিনিসের অভাব নেই, আমি কি চাইব ?'

তবুও কিছু চা। আমি প্রার্থনা পূর্ণ করব। যুবকটি বলল, 'আমায় অলৌকিক কিছু দেখান।'

'তথাস্তু' বলে চেলাটি ওকে সঙ্গে করে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেল এবং ঐ মন্ত্রপূত কাষ্ঠদণ্ডটি যুবকের মাথায় ঠেকিয়ে দিল।

যুবক গঙ্গায় ডুব দিল। কিন্তু আর উঠল না। এবার যুবক উঠল সেই গঙ্গার ঘাটে যেখানে আঠারো বৎসর আগে ডুব দিয়েছিল। উঠে এসে দেখল সেই সাধুরা বসে খিচুড়ি রাঁধছে। যুবকটি বলল, 'সাধুবাবা এমন কি খিচুড়ী রান্না হচ্ছে যে আঠারো বৎসর ধরে এখনও রান্না হচ্ছে ?' সাধুরা বললেন, 'না বেটা, তুমি এই মাত্র স্নান করতে গেলে, এর মধ্যে স্নান হয়ে গেল ?'

চেলাটি তখন যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেই বাজারের সামনে এসে পৌঁছে দিল। চেলাটি বলল, 'বল বেটা কি রকম অলৌকিক দেখলি?' যুবক উত্তর দিল, 'সাধুবাবা, এ রকম অলৌকিক কল্পনাই করা যায় না। আমার এখনও মনে পড়ছে নতুন মা বাপের কথা। কত তাদের যত্ন! না জানি এতক্ষণ তাঁরা কত কান্নাকাটি কচ্ছেন।'

চেলাটি হেসে সেখান থেকে চলে এল এবং যুবকটি ঘরে ফিরে গিয়ে দেখে তার মা ভাত বাড়ছে। যুবকটি মাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'মা এই আঠারো বছর ধরে তুমি ভাত বাড়ছো?'

'সে কি বাবা, এই তো তুমি নাইতে গেলে, এর মধ্যে নাওয়া হয়ে গেল? সাধুবাবা চলে গেলেন?' যুবক অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল। এ কি অলৌকিক ব্যাপার! আমার যে সব কথাই মনে পড়ছে। সেখানকার কারবার, লোকজন, হাকিম মহাজন, মা, বাপ, আত্মীয়-স্বজন! কাউকে তো ভুলি নি! এ কি ব্যাপার!

যাই হোক, যুবক আবার নিজের কাজে মন দিল। ব্যবসা পত্তর যেমন চালাচ্ছিল, তেমনি চালাতে লাগল। মাঝে মাঝে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে নতুন মা, বাপের কথা মনে হলে। কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারছে না—সেটা কোন্ জায়গা।

ওদিকে মাকে ভাত বাড়তে বলে গঙ্গা নাইতে গেল। ছেলে আর ফিরল না। অনেক দেরি হচ্ছে দেখে লোকজন এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। মা ও বাবা দু'জনেই গঙ্গার ঘাটে দেখতে এল। দেখল, সিঁড়িতে তার জামা-কাপড় ছাড়া আছে অথচ তাদের ছেলে নেই। উভয়েই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। গঙ্গার ঘাটে কৌতূহলী স্নানার্থীর ভীড় জমে গেল। সবলেই হায় হায় করছে। আহা অত বড় জোয়ান ছেলে! কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শী বলতে লাগল, 'আমরা স্বচক্ষে দেখলুম ছেলেটি ডুব দিল—কিন্তু আর উঠল না।' সকলেই বোঝাতে লাগল, 'কেঁদে আর কি করবে? ও তোমার ছেলে নয়, তাই চলে গেল।' পুত্রশোকাতুরা মাতা গঙ্গার ঘাটে আছাড়িপিছাড়ি খেতে লাগল। সে দৃশ্যে পাষাণ গলে জল হয়ে গেল, বনের পাখি কেঁদে কেঁদে চক্ষু হারাল।

এইভাবে পুত্রহারা পিতামাতা কেঁদে কেঁদে চক্ষু হারাল।

বৃদ্ধের তেজারতি, মহাজনী, বন্ধকী কারবার ছিল। অনেকে টাকা নিয়ে বন্ধকী মাল ছাড়াতে আসে। বৃদ্ধ তাদের বুঝিয়ে বলেন, আমার ছেলে ফিরে না এলে পাবে না। সে সব জিনিস যে কোথায় রেখে গেছে আমার জানা নেই।

এক সদাগরেরও অনেক জিনিস বন্ধক ছিল। সে ছাড়াতে এলে বৃদ্ধ তাকেও ঐ কথা বলল, 'আমার ছেলে কোথায় সে সব জিনিস রেখেছে আমরা জানি না! সে এলে সব পাবে।'

সেই সদাগর ঘোড়ায় করে কাপড় চোপড় নিয়ে দূর দূর দেশে ব্যবসা করতে যায়। ঘটনাচক্রে সে ঐ দেশে এসে পড়ে যেখানে এই ছেলের কাপড়ের দোকান আছে। সে রাস্তা থেকে ছেলেকে গদিতে বসে থাকতে দেখে। তার সন্দেহ হল। এই তো সেই ছেলে, যার বাপ-মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল। এর কাছেই তো আমি গয়না বন্ধক রেখেছিলুম।

'নমস্কার বাবু! আমায় চিনতে পারছেন?'

অবাক্ হয়ে যুবকটি সেই সদাগরের দিকে চেয়ে রইল। মনে মনে কি চিন্তা করতে লাগল, সহসা উত্তর দিতে পারল না। যেন মনে হল চুরি করে পালিয়ে এসে ছদ্মবেশে ঘুর বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে।

'আমি নিমাই মণ্ডল। চিনতে পারছেন না?'

যুবক আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, তাই চিনতে পারছি, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'আপনি তো সাধন মহাজনের ছেলে? এর মধ্যে আমাদের ভুলে গেলেন? আমাদের সারা কেষ্টপুর শহরে ঢি ঢি কার পড়ে গেছে আপনি গঙ্গায় ডুবে মারা গেছেন। আপনার বাপ-মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছেন। খাওয়া নেই, শোওয়া নেই, ঘুম নেই—খালি 'হা নন্দ, হা নন্দ!' আপনি এমন পাষাণ নন্দবাবু, মা-বাপকে কাঁদিয়ে পালিয়ে এসে এখানে দিব্যি গদিতে বসে কারবার ফেঁদেছেন?'

'তাইতো! কিছু কিছু মনে পড়ছে বটে, কিন্তু আমার বাড়ি তো এখানে আমার মা-বাপও এখানে। অথচ তুমি যা বলছ তাও মিথ্যে নয়। কিন্তু—কিন্তু—কি করে এমন হল। আমি কি করে ওখানে গেলুম—আবার কি করেই বা এখানে এলুম—ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না ভাই।'

'আচ্ছা সে সব কথা থাক নন্দবাবু! আপনাদের বড় ঘরের কথা আমরা বুঝি না এখন আপনি দয়া করে বলুন আমার সে বন্ধকী গয়নাগুলো কোথায় রেখেছেন? আপনার বাবা বলেন, আমার সে সব কোথায় রেখেছে সে-ই জানে। সে এলে তবে পাবে।'

'তোমার নাম তো নিমাই মোড়ল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার গয়না আমাদের ঠাকুরঘরের পুব দিকের আলমারিতে আছে।'

'বাঁচালেন বাবু, আমরা গরিব মানুষ, খুব ভাবনায় পড়েছিলুম। আমি গিয়েই কর্তাকে বলবো, তিনি বার করে দেবেন। নন্দবাবু! আপনি কি ওখানে যাবেন না? একবার গিয়ে যার যা আছে তাকে দিয়ে মা-বাপকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার না হয় চলে আসবেন।'

'কিন্তু নিমাই, সে সব তো মিথ্যে, অলৌকিক। আমি তো আর যাবো না। এই তো আমার দোকান। ঐ আমাদের বাড়ি। আমার মা-বাপ সবই আছেন।'

'তবে ঐ মা-বাপ কার? ওখানকার অতবড় কারবার, গদি কার?'

'কী জানি নিমাই, আমায় বড় ভাবিয়ে তুললে। সেই সাধুবাবা কি অলৌকিক কাণ্ড করলেন বুঝতে পাচ্ছি না। এ কি সমস্যায় ফেললে আমায়! তুমি যাও ভাই, তুমি আমার মা-বাপকে বলো—আমায় ভুলে যেতে। এ সব মায়া—সাধুর খেলা।'

সদাগর ফিরে গেল। দেশে পৌঁছে সাধন মহাজনকে বলল, 'আমার গয়না—তোমার ঠাকুরঘরের পুব দিকের আলমারিতে আছে—আমায় দাও।'

মহাজন উঠে গিয়ে আলমারি খুলে তার গয়না ঠিকই পেলে ওখানে। সদাগরের সঙ্গে হিসেব করে টাকা নিয়ে গয়না দিয়ে দিল। তার পরেই মহাজন প্রশ্ন করল, 'তুমি জানতে তো আগে বলো নি কেন? তোমায় দিয়ে দিতুম।'

'আগে কি আমি জানতুম!'

'এখন জানলে কোথা থেকে?'

'আপনার ছেলে বলেছে।'

'আমার ছেলে? আমার ছেলে কোথায়?'

'সোমাগঞ্জে দেখে এলুম মস্ত গদি। বিরাট কারবার, কাপড়ের দোকান। জিজ্ঞাসা করলুম আপনার নাম নন্দবাবু না? অনেকক্ষণ কোন জবাব দিলেন না। তারপর আপনাদের কথা বলতে, খুব অন্যমনস্ক হলেন। বললেন—একটু একটু মনে পড়ছে বটে, কিন্তু সে তো মায়া—সাধুর কীর্তি—অলৌকিক। এই রকম ধরনের সব কথা। আমার গয়না কোথায় রেখেছেন বলতে দিব্যি বলেন ওখানে আছে।'

'তাহলে আমার ছেলে ডুবে যায়নি—বেঁচে আছে? কিন্তু এখানকার কারবার ফেলে আমাদের ছেড়ে ওখানে কেন আছে?'

তিনি বলেন, 'এই আমার বাড়ি, এই তো আমার দোকান, এখানেই তো আমার মা-বাপ আছে। ওখানে কেন যাবো?'

'এ্যাঁ? সে কি কথা? এখানে আসবে না? ওরে নিমাই, বাবা তুই আমাদের নিয়ে যাবি সেখানে? লক্ষ্মী বাবা আমার!'

'কেন নিয়ে যাবো না কর্তা! চলেন আপনারা আমি নিয়ে যাবো।'

যথাকালে সেই সাধন মহাজন ও তার স্ত্রী নিমাই এর সঙ্গে সোমাগঞ্জে এসে হাজির! বুড়ো মা-বাপ ছেলেকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরেছে—'ওরে নন্দ! তুই যে আমাদের গোকুল আঁধার করে দিয়ে চলে এসেছিস বাপ। ফিরে আয় বাপ।

আমরা যে তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেলুম বাপ! কোন্ অপরাধে আমাদের ছেড়ে এলি? ভাত বাড়তে বলে গঙ্গা ন ইতে এলি, আর ফিরে গেলি না? তোর মনে এই ছিল বাপ!'

কৌতুহলী জনতায় সোনাগঞ্জ বাজার ভরে গেল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেউ ইতিপূর্বে কোথাও শোনে নি। নানা লোকে নানা প্রশ্ন করছে। যুবক তো হতবাক্ হয়ে গেছে!

ওদিকে ছেলের বাড়িতে তার বাপ মা জানতে পারল তাদের ছেলেকে অন্য বাপ-মা সেজে ধরে নিতে এসেছে। তারাও সেখানে এসে হাজির। কেষ্টপুরের বাপ-মা বলে আমার ছেলে, সোনাগঞ্জের বাপ-মা বলে আমার ছেলে। দু'দিকের টানাটানিতে ছেলের প্রাণ যায়।

'চলেন আপনারা আমি নিয়ে যাবো।' [পৃষ্ঠা ৮৬

এদিকে সাধুর চেলাটি তখনও ফিরে যায় নি। অলৌকিক কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়ে গঙ্গাতীরেই বাস করছিল। এত জনসমাবেশ দেখে সে-ও সেদিকে গেল। এ দৃশ্য দেখে সে-ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তখন ভাবল এবার সাধু মহারাজের পরামর্শ ছাড়া উপায় নেই। তখন সে সেই মন্ত্রপূত কাষ্ঠ-দণ্ডটি তিনবার মাটিতে ঠুকল। তৎক্ষণাৎ সেই সাধুবাবা সেখানে এসে হাজির। সাধু এসেই চেলাকে জিজ্ঞাসা করলেন— এখনও ফিরে এলি না বেটা? এত দেরি কেন? তখন চেলাটি সব ঘটনা সাধুবাবাকে বলল। সাধুবাবা শুনে রেগে গেলেন। 'এই জন্যে তোদের আমি লোকালয়ে পাঠাতে চাই নি। তারা দু'জন ফিরে গেল, আর তুই এখানে এই সব কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছিস?'

এই বলে সাধুবাবা ভীড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন দুই দিকে দুজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা মাঝে একটি যুবক অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। দুইদিকে দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা হাপুস নয়নে কাঁদছে। সাধুবাবা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে? তোমরা ছেলেটাকে নিয়ে এমন করছো কেন? তোমরা কাঁদছোই বা কেন?'

দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একসঙ্গে কেঁদে উঠলেন।

সাধুবাবা বললেন, 'এক এক করে বলো। আমি দু'পক্ষের কথাই শুনব।'

সোনাগঞ্জের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বললেন—'বাবা, আমাদের এই একমাত্র পুত্র, একে কোথা থেকে এরা কে জানি না, এসে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা, তুমি আমাদের বাঁচাও—আমাদের নয়নের মণি—আমাদের অঞ্চলের নিধিকে জোর করে নিয়ে যেতে এসেছে।'

কেষ্টপুরের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বললেন, 'বাবা, আমাদের সাত রাজার ধন মানিক অনেক তপস্যা করে আমরা পেয়েছি—আঠারো বছর মানুষ করলুম। একদিন বলল—মা ভাত বাড়ো—আমি টুপ করে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। তার পর এ ছেলে আর ফিরল না। আমরা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেলুম। এরা কি মায়া জানে জানি না। একে ভুলিয়ে এখানে রেখে দিয়েছে। আমরা এক সদাগরের কাছে খবর পেয়ে ছুটে এসেছি একে নিয়ে যেতে।'

সাধুবাবা ক্ষণেক চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা সত্যি বলছ তোমাদের ছেলে?

দু পক্ষই বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

সাধুবাবা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা দু পক্ষই কি তোমার পিতা-মাতা? লজ্জা করো না, বলো।'

ছেলেটি নম্রভাবে বলল, 'আমি মহা সমস্যায় পড়েছি বাবা, আমি দু পক্ষের কাছেই কৃতজ্ঞ। দু পক্ষই আমায় স্নেহ করেন এবং দু পক্ষকেই আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করি।'

তখন সাধুবাবা বললেন, 'তোমরা দু পক্ষই ছেলের একখানা হাত ধর।'

দু পক্ষই ছেলের একখানা করে হাত ধরল।

সাধুবাবা বললেন, 'খুব শক্ত করে ধরো।'

তাঁরা শক্ত করেই ধরলেন। অতঃপর সাধুবাবা সেই মন্ত্রপূত কাষ্ঠদণ্ডটি ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'তোমরা দু পক্ষই জোর করে টান মারো।' দু পক্ষই হ্যাঁচকা টান মারল। তখনই ছেলেটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। দুটি ছেলে একই রকম দেখতে। সমগ্র জনতা আশ্চর্য হয়ে দেখল দুটি যেন জমজ ভাই।

ছেলে দুটির ভেতর কোন পার্থক্য দেখা গেল না। তখন সাধুবাবা এক পক্ষকে বললেন, 'দেখো, এ তোমাদের ছেলে?'

সে পক্ষ বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ, এ আমাদের ছেলে।'

অতঃপর সাধুবাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ তোমার মাতা-পিতা?'

ছেলেটি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

সাধুবাবা বললেন, 'নিয়ে যাও।'

অপর পক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখো, যাকে ধরে আছ এ তোমাদের ছেলে?'

অপর পক্ষ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ মহারাজ, এ আমাদের ছেলে।'

অতঃপর ছেলেকে সাধুবাবা প্রশ্ন করলেন, 'দেখো এ তোমারই পিতা-মাতা ?'

ছেলেটি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ মহারাজ।'

সাধুবাবা বললেন—'যাও, নিজের নিজের ঘরে নিয়ে যাও।'

সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

উভয় পক্ষই সমস্বরে বলে উঠল—'জয় মহারাজ সাধুবাবার জয়।'

তখন সাধু মহারাজ চেলাটিকে ভর্ৎসনা করে সঙ্গে নিয়ে চললেন। যেতে যেতে বললেন, 'তোমাদের বার বার বুঝিয়েছিলাম—নগর, লোকালয় রহস্যপূর্ণ স্থান। সেখানে যাবার চেষ্টা করো না। অপর দু চেলা বুঝতে না পেরে আমার কাছে ফিরে গিয়েছিল—আর তুই বেটা এসে এমন অলৌকিক কাণ্ড বাধালি যে ঝগড়ার সৃষ্টি করলি ?'

চেলাটি করজোড়ে সাধুবাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

বিশ্বাস হবে কি ?

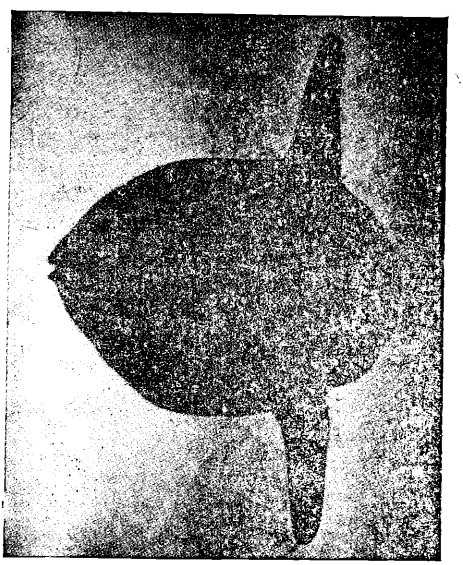

এই মাছটা দেখলে মনে হবে, ধড় থেকে কেটে মাথাটাকে আলাদা করে দেখান হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। এটা একটি মাথাসর্বস্ব সামুদ্রিক মৎস্য। মাপলে অনেক সময়ে আট ফুট দীর্ঘ এই মাছ পাওয়া যায়। তাদের ওজন ২ টনেরও বেশী। এরা রোদ পোয়াতে সমুদ্রের উপর ভেসে থাকে বলে এদের নাম হয়েছে সানফিস। এই সানফিসের মাথায় আর নীচে দুটি লম্বা পাখনা খাড়া হয়ে থাকে।

এই সানফিসরা খুব বোকা। তাই সহজেই মৎস্যশিকারীরা এদের বর্শাবিদ্ধ করতে পারে। একবার বর্শাবিদ্ধ হলে এই মাথাসর্বস্ব মাছটি তার পাখনার ঝাপটায় সমুদ্রের জল তোড়পাড় করে নৌকাসুদ্ধ শিকারীদের বহুদূর অবধি ভীষণ জোরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

সানফিসের মাংস খেতে ভাল নয়, কিন্তু এর গা থেকে যা তেল বেরোয় তার লোভে শিকারীরা এদের মেরে বেড়ায়।

বিদেশী গল্প

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

পঞ্চাশ একর হাতার মধ্যে বিশাল বাড়ি "হোয়াইট-গেটস্"। গোটা চার পাঁচ চাকর-দাসীর কথা বাদ দিলে সে বাড়িতে সারা ক্লেবার্ণ একা। সন্তান কোনদিন হয়নি, স্বামী জিম ক্লেবার্ণ, এই অল্পদিন আগেই দেহরক্ষা করেছেন।

এ-বাড়িতে সারা একা বটে, কিন্তু তাই বলে আপনজন যে তাঁর কেউ কোথাও নেই, তা মোটেই নয়। ক্লেবার্ণদের এক গোষ্ঠী আছে বোস্টনে, নিউইয়র্কে হেপবার্গদেরও জমজমাট সংসার, ওটাই বাপের বাড়ি সারার। জিম মারা যেতে দুই জায়গা থেকেই জোর অনুরোধ এসেছিল, "সারা, তুমি সেই তেপান্তর মাঠে কদাচ একা থেকো না বাপু, চলে এস আমাদের কাছে। একটা ফ্ল্যাট দেখে দিচ্ছি, আরামসে থাকবে।"

তা সারা কর্ণপাতও করেন নি সে-কথায়। বাপ-মা নেই, আছে ভাইয়েরা, তাদের বৌয়েরা, তাদের ডজন ডজন ছেলেমেয়েরা। এদিকেও শ্বশুর শাশুড়ী নেই, আছে ভাশুর দেওরেরা, তাদের বৌয়েরা, তাদেরও ডজন ডজন—

রক্ষে কর! ঐ লোকারণ্যের ভিতর সারার দম আটকে আসবে তিন দিনের ভিতর। আজ ডিনার, কাল ব্রীজ পার্টি, পরশু পিকনিক। না গেলে মন-কষাকষি হবে, গেলে আরও বেশী। সবাই দাবি করবে—"ডু অ্যাট রোম অ্যাজ রোম ডাজ" যস্যার্থঃ—"যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদীপার।" রক্ষে কর! পাক্কা চল্লিশ বৎসর এই হোয়াইট গেটস্ ভবনে স্বামীর সঙ্গে একা একা কাটিয়েছেন সারা। আজ স্বামী নেই বলেই সারা চল্লিশ বছরের বাঁধন ছুরির এক পোঁচে কেটে ফেলে ফ্ল্যাটের আশ্রয় নেবেন বোস্টনে বা নিউইয়র্কে? হাসির কথা! এমন প্রস্তাব যারা করতে পারে, স্পষ্টতঃই সারা ক্লেবার্ণকে চেনে না তারা।

ভয়ানক শক্ত মানুষ সারা, এক মস্বর স্বাধীনচেতা। মিশুক বা সামাজিক লোক যাকে বলে, তা মোটেই নয়। জিম বেঁচে থাকতে তবু বা আত্মীয় স্বজনদের কিছু-কিঞ্চিৎ যাতায়াত ছিল এখানে, ইদানীং তা একদম বন্ধ। তাঁদের শেষ পদার্পণ ঘটেছিল জিমের অন্ত্যেষ্টি-উপলক্ষে। তারপর আর না। সারা ডাকেন নি কাউকে। একমাত্র ইবার্ট-ভাইকে ছাড়া।

ইবার্ট-ভাই হচ্ছেন ইবার্ট স্নোডেন, জিমের মাসতুতো ভাই এবং সারার মামাতো। বয়সে সারার চাইতে বছর কুড়ি কম, কুনোমিতে সারার চাইতেও এক কাঠি উপরে। সারা তবু সাহস করে স্বামীর ঘরে ঢুকেছিলেন, ইবার্ট একটা বৌ ঘরে আমার মত সাহস এখনও সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি। "ওরে বাপ! বিয়ে করা তারই পোষায়, বেড়ালের মত যার নয়টা প্রাণ। আমার প্রাণ একটাই মাত্র, সেটা আমি জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসর্গ করে বসে আছি। কাকে? বৌকে নয়, বইকে।"

সত্যিই, পড়াশুনা নিয়েই মশগুল হয়ে রয়েছেন ইবার্ট, জীবনের এই সবচেয়ে চটকদার চল্লিশটা বছর। যাতায়াতের জায়গা হল নিউইয়র্কের লাইব্রেরীগুলো, আর ক্বচিৎ কদাচিৎ ক্লেবার্ণদের এই হোয়াইট গেটস্। এখানে তিনি আসেন শুধু এই সাহসে যে এ-বাড়ির ছয় মাইলের ভিতরে কোথাও ভদ্র গৃহস্থের বসতি নেই। প্রজাপতির এমন সাধ্য নাই যে তাঁকে পাকড়াবার জন্য এখানে ফাঁদ পেতে রাখবেন।

আত্মীয়দের ভিতরে একমাত্র ইবার্টকেই সহ্য করতে পারেন সারা, তাঁকেই হোয়াইট গেট্‌সে ডেকে আনেন মাঝে মাঝে, ধরে রাখেন দুই এক হপ্তার জন্য। মোটর বোঝাই করে বই নিয়ে আসেন ইবার্ট, সেগুলি পড়া শেষ না হচ্ছে যতদিন, থাকবার অসুবিধে নেই তাঁর।

এবারে ইবার্ট এসে এক হপ্তা ছিলেন, চলে গেলেন সবে কাল। তা কালই চলে যাওয়াটা মন্দ হয় নি, আজ সকাল থেকেই আবহাওয়াটা পালটে গিয়েছে বিশ্রীরকম। কালও

আকাশ ছিল নির্মল, আজ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। দমকা হাওয়া বইছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে। অসময়ে বরফ পড়বে, তারই লক্ষণ। বৃষ্টি তো মাঝে মাঝে ঝরছেই এক এক পশলা।

সারা সকালটা ঘরেই বসে রইলেন সারা। লাঞ্চ পর্যন্ত। যখন যে ঘরেই বসছেন, আসন তাঁর জানালার ধারে। বসে বসে দেখছেন—বৃষ্টির ধারাগুলো ত্যারছা-ভাবে নেমে আসছে আকাশ থেকে, ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে ঘোড়সওয়ারেরা যেমন নামে শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করবার সময়। বেশ লাগে দেখতে। গায়ে মাথায় ঠাণ্ডা লাগছে, তা সত্ত্বেও বসে বসে এই দৃশ্য দেখেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ইবার্ট থাকলে সেও হয়ত পাশে বসে দেখত এই বর্ষা। নীরবেই বসে বসে উপভোগ করত একে। কারণ সারা জানেন, ছন্দের নাচুনির নীচেই যে-নাচ কাব্যরসিক ইবার্টের পছন্দ, তা হল উদার প্রান্তরে আলোছায়ার পটভূমিতে বর্ষার নৃত্য।

বিকালের দিকে আকাশের মেঘ যদিও কাটল না, বৃষ্টিটা কিন্তু থেমে গেল। সারা উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। বেড়াতে বেরুবেন। ঘনঘটা করে তুষার ঝঞ্ঝা শুরু না হচ্ছে যতদিন, প্রাত্যহিক চার পাঁচ মাইল হাঁটাহাঁটি কিছুতেই বন্ধ হওয়ার নয় সারার। প্রান্তরের বুক চিরে যে গাড়ির রাস্তা চলে গিয়েছে নরিংটন শহরে, বেরুবার সময় সেই রাস্তা ধরেই সারা সাধারণতঃ বেরিয়ে থাকেন, ফেরার সময় ফেরেন শেকার-এর বনভূমির ভিতর দিয়ে। রাস্তা থেকে ঠিক এক মাইল দূরত্ব বজায় রেখে ওরই সমান্তরালে বরাবর ছড়িয়ে পড়ে আছে শেকার বন, গাছে গাছে বাদামী পাতা, ঝোপে ঝাড়ে হলদে ফুল আর ঝর্ণায় ঝর্ণায় গোধূলি-আলোর ঝলমলানির দৌলতে এই হেমন্তে যাকে পল্লীর দেশ বলে ভুল করে ভাবুক লোকেরা।

বনের সীমা পেরিয়ে খানিকটা মাঠ ভাঙ্গতে হল আবার, তারপরে সারা এসে ঢুকলেন হোয়াইট গেটস্-এর হাতার ভিতরে। গেট থেকে কাঁকর বিছানো চওড়া পথ অনেকগুলো বাঁক খেয়ে খেয়ে অবশেষে থেমেছে গিয়ে বাড়ির সিঁড়িতে। একটা বাঁক ঘুরতেই সারা দেখলেন—তাঁর থেকে অল্প আগে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকেই হেঁটে চলেছে এক অচেনা বুড়ী। চেহারা বা বেশবাস—কোন দিক দিয়েই সে বুড়ী নজরে পড়বার মত নয়। তবু যে সারার নজরে সে পড়ল, তার কারণ শুধু এই যে মাঠে বনে রাজপথে একটানা তিনঘণ্টা চক্কোর দেবার সময় একটিও মনুষ্যমূর্তি সারার চোখে পড়েনি, এমনই নির্জন পরিবেশ হোয়াইট গেটস্-এর।

"কোথায় যাবে গা তুমি?"—বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন সারা।

"ঐ যে হোথা—" আঙ্গুল তুলে সারার বাড়িই দেখিয়ে দিল বুড়ী। ওর কথায় সুরটায় যেন বিদেশী টান একটু ধরা পড়ল সারার কানে। এ অঞ্চলের লোকের কথার মত নয় ঠিক।

"ওখানে কার কাছে যাবে? কী দরকার?"—আবারও জানতে চাইলেন সারা।

"এমনি, একটা মেয়ে কাজ করে ওখানে, তারই কাছে—" বলল বুড়ী; কী দরকার, তার কোন জবাব নেই।

সারাও আর ঘাঁটালেন না ওকে। কাজ তাঁর বাড়িতে গোটা তিনেক মেয়েই তো করে, তাদেরই কারও আপনজন হতে পারে বুড়ী। কাজ কী তাঁর সে খবরে?

সারা জোর পায়ে হেঁটে চলেছেন সিঁড়ির দিকে। বুড়ী পিছনে পড়ে আছে। হেঁটে চলেছেন, হঠাৎ কেমন করে যেন পা হড়কে পড়ে গেলেন সারা। পড়ে গিয়েই আর উঠতে পারেন না। গোড়ালি বুঝি ভেঙ্গেই গেল।

শক্তসমর্থ মানুষ সারা ক্লেবার্ণ এই ষাট বছর বয়সেও। গায়ের জোর, গলার জোর, দুই-ই বিলক্ষণ বজায় রেখেছেন এখনও। চেঁচামেচি করে বাড়ি থেকে এনে ফেললেন দাসদাসীদের। তারা জনা-চারেক মিলে ওঁকে বাড়িতে এনে তুলল, চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে। সেই চেয়ারে বসেই সারা টেলিফোন করলেন—নরিংটনে ডাক্তার সেল্‌গ্রোভের কাছে।

বহুকালের ডাক্তার। এ-বাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক। এসেই রসিকতা জুড়ে দিলেন—"বন্ধু ক্লেবার্ণও স্বর্গে গেলেন, আমিও নরকস্থ হলাম। দারিদ্র্যের মত নরক আর নেই, তা অবশ্য জানেন মিসেস ক্লেবার্ণ। ক্লেবার্ণের ছিল রক্তমাংসের দেহ, অসুখটা বিসুখটা হত মাঝে মাঝে, দু'চার পয়সা জুটত আমার বরাতে। আপনার তো ভদ্রে লোহার শরীর। ভেবেছিলাম—এ বাড়ির ডলারের কী রং, তা আর চর্মচক্ষুতে দেখব না কোনদিন। তা ভগবান আছেন—বলি, হয়েছে কী? পা ভেঙেছেন?"

বেদম এক চোট হেসে নিলেন ডাক্তার—"কারও অন্ন মেরে দেওয়া মহাপাপ, জানেন তা? সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত—"

পা পরীক্ষা করে বললেন—"কথা যদি যেন যে প্রাণান্তেও বিছানা থেকে উঠবেন না, তাহলে অমনি অমনি রেহাই দিয়ে যাই আজকের মত। আর তা যদি না দেন, এক্ষুণি গোড়ালিতে প্ল্যাস্টার করব—উপরে হাঁটু, নীচে বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত। কী বলেন?"

প্ল্যাস্টারে খুব ভয় সারার, কথা দিলেন যে নড়বেন না।

বললে কী হবে, ডাক্তার তবু অমনি অমনি রেহাই দিলেন না, প্ল্যাস্টার না করুন, ব্যাণ্ডেজ একটা বাঁধলেন। ওষুধ দিলেন, কিন্তু ভরসা দিলেন না। "এক্স-রে না করে কিছু বলা যাবে না। যে রকম ফুলে উঠেছে, পরশুর আগে আর করা যাবে না এক্স-রে। পরশু সকালে দশটায় আমি আসছি—"

উঠে যাবার মুখে তিনি কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন একবার—"বলেন তো একটা নার্স

পাঠিয়ে দিই গিয়ে। সেবা বরার দরকার কিছু হবে না এক্ষুণি, কিন্তু একটা লোক কাছে থাকলে কথায়বার্তায় সময় কাটত ভাল। ঘুম ভাল না হতে পারে হয়ত। সেই জন্যই বলছি নার্সের কথা—"

"নার্স কী হবে?"—কথাটা উড়িয়েই দিলেন সারা—"আমার ঝিয়েরা সব পুরোনো লোক, আমার শাশুড়ীর আমল থেকে এ-বাড়িতে আছে, কথাবার্তা ওরা কি কইতে পারবে না দরকার হলে?"

"তা পারবে"—বললেন ডাক্তার—"আপনার ভৃত্যভাগ্য ভাল।"

সারা এ-বিষয়ে একমত ডাক্তারের সঙ্গে। তিনটি দাসী, অ্যাগনেস, মেরী, এসথার। এখানে ওদের চাকরির বয়স যথাক্রমে বাইশ, তেরো এবং এগারো বছর। এযুগে এমন ব্যাপার হোয়াইট গেটস্ ছাড়া অন্য কোন বাড়িতে কেউ দেখাতে পারবে না। কথায় কথায় এখন নোটিশ দিচ্ছে ঝি-চাকরেরা। চাকরি—যেন তারা নিজের প্রয়োজনে করে না, করে স্রেফ পরোপকারের জন্য মনিবদের উপরে দয়াপরবশ হয়ে। এ বাড়ির ভৃত্যেরা যে অন্যরকম, সারা সেজন্য তারিফ করেন নিজের ব্যক্তিত্বকে। মনে মনে ধারণা আছে তাঁর, মনিব তিনি ভাল। নিজে ভাল হলে জগৎ ভাল হয়, এ আর না জানে কে।

যা হোক, ডাক্তার তো গেলেন।

ব্যথাটা ক্রমেই বাড়ছে পায়ে। শুয়ে শুয়েই ডিনার খেতে হল সারাকে। চেষ্টা করলে অবশ্য উঠে গিয়ে বসতে পারতেন ডিনার টেবিলে, কিন্তু তা গেলেন না। ডাক্তারকে যে কথা দিয়েছেন, বিছানা ছেড়ে উঠবেন না বলে!

রাত্রে যাতে মনিবনীর কোন কষ্ট না হয়, তার সব ব্যবস্থাই করছে অ্যাগনেস। হাতের নাগালে টিপয়, তাতে লেমনেড। একটা ছোট টেবিল টেনে এনে টিপয়ের পাশে রেখেছে, তার উপরে খাবারের ট্রে একখানা, স্যাণ্ডউইচে বোঝাই সে ট্রে।

সারা বিস্মিত, বিরক্ত। "স্যাণ্ডউইচ কী হবে? আমি খাই না কি রাত্রে? কোনদিন খেয়েছি নাকি? আজ পা ভেঙেছে বলে কি পেটেও আগুন জ্বলেছে?"

"না, তা নয়"—অ্যাগনেস দরদে গলে পড়ছে—"তবে বলা তো যায় না, যদিই পেয়ে যায় ক্ষিধে—"

"কক্ষনো পাবে না"—অ্যাগনেসের আদিখ্যেতায় সারা বিরক্ত হয়ে উঠছেন, রেগে যাচ্ছেন—"নিয়ে যাও, স্যাণ্ডউইচ—"

রাগ দেখে অ্যাগনেস ট্রেসুদ্ধ টেবিল সরিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু রেখেও যে দিল পাশের ঘরেই, শুয়ে শুয়েও তা টের পেলেন সারা। তবে ও নিয়ে আর চেঁচামেচিও করলেন না কিছু, পায়ের ব্যথার দরুন কথা কইতেই তাঁর ইচ্ছে হচ্ছে না।

অ্যাগনেস চলে গেল রাত্রির মত। সারা ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

না, ঘুম হচ্ছে না। অন্ততঃ অন্যদিনের মত হচ্ছে না। রোজ এক ঘুমে রাত শেষ হয়ে যায় সারার, আর আজ দেখ না! মিনিটে মিনিটে চটে যাচ্ছে ঘুম। ব্যথার জন্যই যে শুধু, তাও তো নয়! কী যেন একটা অস্বস্তি। শুধু দেহে নয়, মনেও। কে যেন কোথায় ভারী একটা অন্যায় কাজ করছে কিছু, এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা। এক্ষুণি উঠে গিয়ে তাদের ধমকে দেওয়া দরকার। এমনি একটা অবচেতন ঝোঁক। ভারী অস্বস্তি। পায়ের ব্যথার কথা মনে থাকছে না এই অস্বস্তির দরুন এক এক সময়, আবার অন্য সময়ে ওরই দরুন ব্যথাটা হয়ে উঠেছে ডবল কষ্টদায়ক।

—"নিয়ে যাও, স্যাণ্ডউইচ—" [পৃষ্ঠা ৯৪

ঘড়ির সবগুলো বাজনা শুনে যাচ্ছেন সারা, একটার পরে একটা। টং টং টং। কোয়ার্টারের বাজনা, হাফ-আওয়ারের বাজনা, তিন কোয়ার্টারের বাজনা, সব শেষে বাজনা পুরো ঘণ্টার। বারোটা, একটা, দুটো—

পৌনে আটটা বাজল অবশেষে। সকাল হয়েছে, পর্দার ফাঁকে ফাঁকে বাইরের আলো এসে উঁকি দিচ্ছে লাজুক শিশুর মত। এইবার অ্যাগনেস আসবে। আটটা বাজলেই। রোজই আসে। আটটার অষ্টম টং যেই বেজে ওঠে ঘড়িতে, দরজাও খুলে যায় খুট করে পাশের ঘরে। ও-ঘরটা এই শয়নকক্ষেরই অংশ বলতে গেলে, ঐ ঘরের ভিতর দিয়েই এ ঘরে আনাগোনার পথ।

বাজছে আটটা। শেষ হয়ে গেল বাজনা। এইবার খুলছে দরজা খুট করে। কই, না তো! খুলছে তো না! ছোট্ট সে আওয়াজটুকু হচ্ছে না তো খুট করে। এ হল কী? অ্যাগনেসের কি ঘুম ভাঙে নি? কেন ভাঙবে না? এতকাল ভেঙে এল, আজই ভাঙবে না?

যেদিন পা ভাঙল মনিবনীর, সেই দিনই ? যেদিন অ্যাগনেসের প্রত্যাশায় ঘণ্টার পরে ঘণ্টা, মিনিটের পরে মিনিট গুনছেন মনিবনী, সেই দিনই ? তাজ্জব !

শুধু তাজ্জব ? হাজারোবার তাজ্জব। এখনও অ্যাগনেসের দেখা নেই, সওয়া আটটা বেজে গেল এদিকে। ধৈর্য আর রইল না। খাটের ছত্রি থেকেই ঘণ্টার দড়ি ঝুলছে, হাত তুলে তাতে টান দিলেন সারা। অ্যাগনেসের ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠেছে এতক্ষণে, হতচ্ছাড়ীর ঘুম এবারে আর না-ভেঙে যাবে কোথায় ? ধড়মড়িয়ে উঠে এক্ষুণি ছুটে আসবে হন্তদন্ত হয়ে। অ্যায়সা বকুনি দিতে হবে একখানা—

কই ? কেউ তো আসছে না হন্তদন্ত হয়ে ? ঘণ্টাটা বেজেছে তো ? কে বলবে তা ? ও-মাথা পর্যন্ত তারটা ঠিক ঠিক বজায় আছে তো ? না থাকবার কথা নয়, কিন্তু আজ যে সবই কেমন-কেমন হয়ে যাচ্ছে !

সাড়ে আটটা। কিছু একটা ঘটেছেই ওদিকে। অসুখ করল অ্যাগনেসের ? করেও যদি থাকে, অ্যাগনেসের পাশের ঘরেই থাকে মেয়ী। সেও কি ঘণ্টার বাজনা শুনতে পাবে না ? নাঃ, গুরুতর কিছু ঘটেছে। এই এতক্ষণে প্রথম মনে হল সারার, ডাক্তারের কথা মত কাল যদি একটা নার্স নিতেন তিনি, ভালই হত তাতে। সে তো সারার কাছেই থাকত ! অনায়াসে তাকে নীচে পাঠানো যেত সেখানকার হাল-চাল দেখে আসবার জন্য।

হয় নি নার্স নেওয়া। তার ফলে, অ্যাগনেসকে যদি ডাকতে হয়, স্বয়ং সারাকেই নীচে নামতে হবে। ডাক্তারকে কথা দেওয়া আছে, প্রাণান্তেও সারা শয্যা ছেড়ে উঠবেন না। কিন্তু এ-ব্যাপার যে সারার একার প্রাণান্ত নয় ! নীচের সবাইয়ের প্রাণ রাতারাতি অন্ত হয়ে গেল কি না, কে বলবে ? তেপান্তরের মাঠের ভিতর এই একখানি বাড়ি হোয়াইট গেটস্, রাত্রিবেলা কোন খুনে ঘাতক এসে যদি পাঁচটা ঝি-চাকরের গলা কেটে রেখে গিয়ে থাকে ?

কেন কাটবে ?

এ-প্রশ্ন মোটে প্রশ্নই নয়। আজকাল গলা-কাটা একটা শখের ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। হামেশাই এমন উন্মাদের কাহিনী কাগজে পড়া যায়, যারা বিনা কারণে, বিনা স্বার্থে, বিনা উদ্দেশ্যে খুনের পরে খুন করে যায় স্রেফ সময় কাটাবার জন্য। তেমন উন্মাদ কাল রাতে কেউ হোয়াইট গেটস্-এ এসে পড়েই নি যে, কে তা জোর করে বলতে পারে ?

খোঁজ নেওয়া একান্ত দরকার। বেল বাজিয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি, এবারে টেলিফোন করে দেখা যাক। তাতেও যদি কাজ না হয়, অগত্যা নেমে যেতেই হবে, উপায় নেই।

টেলিফোনে রান্নাঘর পাওয়া যাবে, একটা লাইন আছে ওখানে। কোন রকমে ফোন ধরতে পারা দরকার এখন। তাহলেই বোধহয় রহস্যের কিনারা হয়।

বেল ঝুলছিল খাটের কোণে, শুয়ে শুয়েই তা হাতে পাওয়া গিয়েছিল। ফোন পেতে হলে কিন্তু পাশের ঘরে যেতে হবে। কষ্ট? তার আর করা যাচ্ছে কী? নিরুপায় যখন।

অতি কষ্টে উঠে, এক পায়ে ভর করে দেয়াল ধরে ধরে, প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ষমযন্ত্রণা ভোগ করে করে অবশেষে সারা টেলিফোনের কাছে পৌঁছুতে পারলেন। যোগাযোগ করতে চাইলেন রান্নাঘরের সঙ্গে। কা কস্য পরিবেদনা! সাড়া নেই। ফোনের দশাও বেল-এর মত।

ফোনটা ঠিক আছে তো? সারা ডায়াল করলেন এক্সচেঞ্জ। সাড়া নেই তবু। লাইন কাটা। খুনী ডাকাত যারা এসেছিল, ফোনের লাইন আগেভাগে কেটে দিয়েছে তারা। বেল-এর বেলায়ও অবশ্যই তাই। আটঘাট বেঁধে কাজ করেছে ওরা। সোজা লোক নয়।

সারা এখন করেন কী? কী করেন তিনি? কেমন করে খবরটা নেন যে নীচের অবস্থা কী? যদি খুনোখুনিই হয়ে থাকে, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গেই বা যোগাযোগ করেন কেমন করে? এমন অনেক বাড়ি আছে, যেখানে দুধ, মাংস, রুটি, খবরের কাগজ যোগান দেওয়ার জন্য শহর থেকে লোক আসে রোজ। হোয়াইট গেটস্-এ সে ব্যবস্থা নেই। রোজ সকালে খানসামা প্রাইস চলে যায় সাইকেল চেপে, নরিংটন থেকে নিয়ে আসে সব জিনিস। আজ কেউ যাবে না, যদি প্রাইস খুন হয়ে থাকে।

উঠলেন আবার সারা। একটা লাঠি ঝুলছে দেয়ালে। তাঁর স্বর্গীয় স্বামীর লাঠি। পেড়ে নিলেন ওটা। ভর দিয়ে হাঁটা যাবে। দেরাজে রিভলবার আছে স্বামীর। সেটাও বার করলেন। খুলে দেখলেন টোটা আছে কি না। যত রকমের সম্ভব, তৈরী হয়ে নিলেন নীচে নামবার আগে।

এক একটা ধাপ নামছেন সিঁড়ির, পায়ের ভিতর তপ্ত শূল যেন কেউ বিঁধিয়ে দিচ্ছে। তবু—তবু নেমে চলেছেন সারা, এক হাত দেয়াল ধরেছে, আর এক হাত লাঠি। রিভলবার? সেটা কোমরে গোঁজা।

একতলার প্রথম ঘরই অ্যাগনেসের। ঘরে ঢুকলেন সারা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লাশ পড়ে নেই, ঘরে রক্তের ঢেউ খেলছে না, খুনোখুনি যে হয়েছে, এমন চিহ্ন কিছু নেই। অধিকন্তু, বিছানা দেখে একথা মনে হয় না যে তাতে রাত্রে কেউ শয়ন করেছিল।

পাশের ঘর মেরীর, সে ঘরেরও ঐ একই দশা।

রান্নাঘরটা অনেক দূরে। ভাঁড়ার ঘর, বারান্দা, চাকরদাসীদের আরও তিনখানা ঘর —সব পেরিয়ে। অতখানি হেঁটে যাওয়া কি সম্ভব হবে সারার পক্ষে? ভাঙ্গা পা নিয়ে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শক্তি আর সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টায় আছেন সারা, হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল। অনেকের গলার মিলিত আওয়াজ। ব্যাপার কী? খুনীরা কি

এখনও বাড়ির ভিতরই রয়ে গেছে? ডাকের মাথায় অন্য লোক নেই, কর্ত্রী ভাঙা পা নিয়ে উপরে পড়ে আছেন শয্যাগত, এই সাহসে খুনীগুলো কি দিনের বেলাতেও আড্ডা দিচ্ছে এখানে?

আড্ডা? নিশ্চয়? আওয়াজটা গানের। তাও আবার বিদেশী কোন ভাষার গান সেটা। কী অদ্ভুত সুর তার। কী বিটকেল গলাই বা গায়কদের। শুধু গায়কও নয়, আছে গায়িকাও। অভাবনীয়! দুর্বোধ্য!

ভয়ের চেয়ে এখন উত্তেজনা বেশী সারার মনে। পায়ের ব্যথার কথা আর তাঁর খেয়ালেই আসছে না। দেয়াল ধরে ধরে তিনি এগিয়ে চললেন রান্নাঘরের দিকে। গানটার আওয়াজ সেখান থেকেই আসছে, মনে হয়।

সারা দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন রান্নাঘরের। ডান হাতে রিভলবার, বাঁ হাতে দরজা নিঃশব্দে ফাঁক করলেন একটু। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন।

ঘরময় নীল আলো জ্বলছে মিটিমিটি। একটা পচা গন্ধ ভকভক করছে। কয়েকটা শূকর পড়ে আছে গলা কাটা। একটা গামলা রক্তে ভর্তি। তার চারদিকে গোল হয়ে বসে ও দাঁড়িয়ে মানুষ গোটাকতক আর ছায়মূর্তি আরও গোটাকতক।

মানুষগুলিকে চিনলেন সারা—তাঁরই লোকজন সব! অ্যাগনেস, মেরী, প্রাইস প্রভৃতি। ছায়ামূর্তিদের ভিতরেও একজনকে চিনলেন—সে কাল সন্ধ্যার সেই বুড়ী, যার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই পা ভেঙেছিল সারার। কাল তাকে জ্যান্ত মানুষ মনে হয়েছিল, আজ সহজেই বোঝা যাচ্ছে প্রেতিনী বলে। একদম স্বচ্ছ. তাদের গায়ের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে পিছনের দেয়াল পর্যন্ত।

ছায়া ও কায়া—সবাই মিলে গান গাইছে সেই ভুতুড়ে ভাষায়, আর গামলা থেকে বাটি বাটি রক্ত তুলে ঢেলে দিচ্ছে গলায়। তারপর গানের সঙ্গে শুরু হল নাচ. অশ্লীল, উদ্দাম, তাথৈ নৃত্য। কয়েক মুহূর্ত তা চোখে দেখার পরই সারার মনে হল—তাঁরও অন্তরতম অন্তরে একটা পিশাচী নড়ে চড়ে জেগে উঠছে যেন। ভয় পেয়ে তিনি বুকের উপর ক্রশ আঁকতে গেলেন, হাতে যে রিভলবার রয়েছে, তা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। রিভলবারটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে বুলেট ছুটে বেরিয়ে বিদ্ধ করল সেই প্রেতিনী বুড়ীকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নারকীয় হুংকারে গমগম করে উঠল বাড়িটা, আর বুড়ী প্রেতিনী সমেত সবগুলো ছায়ামূর্তি চোখের পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

রইল অ্যাগনেসরা পাঁচজন শুধু। তারা যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে

ফ্যাল-ফ্যাল করে চাইছে চারিদিকে। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না, সারাকে পর্যন্ত তারা চিনতে পারছে না যেন।

সারা কীভাবে যে উপরে উঠে এলেন, তা তাঁর হুঁশ ছিল না কিছু।

হুঁশ হল নিজের ঘরে ঢুকবার পর। তারপরই তিনি প্রার্থনায় বসলেন।

সারাদিন মেঝেতে বসে ভগবানকে ডাকলেন সারা, এই প্রেতসংস্পর্শ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

অবাক কাণ্ড, প্রার্থনা সেরে বিকাল নাগাদ তিনি উঠে দাঁড়ালেন যখন, ভাঙা পা জোড়া লেগে গিয়েছে তাঁর, তাতে আর লেশমাত্র ব্যথা নেই। খিদে বেশ হয়েছিল। ছোট টেবিলটার উপরে স্যাণ্ডউইচের ট্রে তখনও রয়েছে, সেই স্যাণ্ডউইচ দিয়েই জঠরজ্বালার নিবৃত্তি হল সারার। আগে থাকতে এই খাবার গুছিয়ে রেখে যাওয়াতেই প্রমাণ হল যে রাত্রে যা কিছু হয়েছে, তা অতর্কিতে হঠাৎ হয়নি, অ্যাগনেসেরা আগে থাকতে সবই জানত।

সারা যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। [পৃষ্ঠা ৯৮

রাত্রি এল আবার নিঝুম নিস্তব্ধ পুরী। সারার খুবই ভয় করছে আবার। বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ভগবান স্মরণ করছেন—"রক্ষা কর! রক্ষা কর প্রভু!"

ভয় সত্ত্বেও শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সারা, ঘুম যখন ভাঙল, অ্যাগনেস তখন ঢুকে পড়েছে ঘরে। ঘড়িতে ঐ আটটা বাজছে, বেজে শেষ হয়নি এখনও। ঠিক আটটাতেই তো ও আসে রোজ!

"সুপ্রভাত মাদাম"—মোলায়েম সুরে বলছে অ্যাগনেস—"পায়ের ব্যথা কি একটু কম মনে হয়? কাল যা বলে গেলেন ডাক্তার—নড়া-চড়া না-করার কথা, আশা করি আপনাকে উঠতে হয়নি একবারও?"

"ডাক্তার কাল বলে গেলেন, না পরশু?"—মাদামের কথা তীক্ষ্ণ ও তিক্ত।

"পরশু? সে কী কথা মাদাম? ডাক্তার তো কাল সন্ধ্যায়—" অ্যাগনেস এমন-ভাবে মনিবনীর পানে চাইছে, যেন সে পাগল ঠাউরেছে তাঁকে।

"কাল সন্ধ্যায়?"—ব্যঙ্গের সুরে কথা কইছেন সারা—"কাল সারাদিন কী কষ্টেই যে কেটেছে আমার"—হঠাৎ তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন, শুধু বললেন—"কাল কি পরশু, তা ডাক্তার এলে তাঁর কাছেই শুনতে পাবে—"

"ডাক্তার তো আসতে পারবেন না আজ"—মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল অ্যাগনেস—"একটু আগেই তিনি ফোন করেছিলেন—"

"ফোন? ফোন কি আবার চালু হয়েছে নাকি? কাল তো ফোনও ছিল না। বেলও বাজেনি—"

"আপনার, মানে অপরাধ যদি না নেন তো বলি—সবই আপনার ভুল মাদাম! ফোনও চালু, বেলও চালু, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন—আর কি!"

এবার একেবারে গুম হয়ে গেলেন সারা। উঠে বসলেন, উঠে দাঁড়ালেন।

"আ হা হা, উঠবেন না মাদাম, উঠবেন না দয়া করে। ডাক্তার যা বলে গিয়েছেন—"

"তা বটে, ডাক্তার যখন নিষেধ করেছেন, উঠবই না।"—একেবারে সুশীলা বালিকার মত দাসীর কথা শিরোধার্য করে বিছানায় আবার বসে পড়লেন সারা। "তুমি যাও, প্রাতরাশ নিয়ে এস এখানেই। ক্ষিধে পেয়েছে—"

"তা আনছি, কিন্তু উঠবেন না মাদাম, দোহাই আপনার—"

অ্যাগনেস বেরিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সারা উঠে গিয়ে বসলেন ফোনের কাছে। সত্যিই তো ফোন চালু হয়েছে আবার! ডাক্তারকে ডাকা মাত্র সাড়া পাওয়া গেল।

"সুপ্রভাত, আপনি ফোন করেছিলেন নাকি?"—বললেন সারা।

"আমি? সে কী?" "ডাক্তার আকাশ থেকে পড়লেন যেন—"বরং আপনার ওখান থেকেই আপনার দাসী ফোন করল এই বলে যে আপনি ভাল আছেন, আজ আর আমার আসার দরকার নেই—"

"ব-টে! দেখুন ডাক্তার, একটা দারুণ গোলমাল হয়েছে। আমি সাক্ষাতে বলব সব। আজ বা কাল আমি দেখা করছি আপনার ওখানে গিয়ে। ভাল কথা, আপনি বলুন তো, আমাকে আপনি দেখতে এসেছিলেন কাল সন্ধ্যায়? না, পরশু?"

"এ সব কী প্রশ্ন, এ্যাঁ?" —ডাক্তার ককিয়ে উঠলেন—"ভেঙেছে পা, তাতে মাথা গোলমাল হবে কেন? আমি পরশু গিয়েছিলাম। কাল নয়, পরশু।"

"ধন্যবাদ"—বলে ফোন ছেড়ে দিলেন সারা। তারপর আবার ডায়াল করলেন—এবার নিউইয়র্কে ইবার্ট ভাইকে।

ইবার্টকে যা বললেন, তার ফলে ইবার্ট বিকাল নাগাদ সশরীরে এসে পড়লেন দুখানা ট্রাক আর একখানা গাড়ি নিয়ে। পাঁচটি চাকরদাসীর তো চক্ষুস্থির! তাদের তিন মাসের মাইনে আগাম দিয়ে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে।

খুব বেশী দরকারী জিনিসগুলো ট্রাকে চাপিয়ে দিয়ে সারা গাড়িতে উঠে বসলেন ইবার্টের পাশে। স্বামীর ভিটের মায়া তাঁকে কাটাতে হল প্রাণের মায়ায়। তিনি নিউইয়র্কে ফ্লাট ভাড়া নিয়েই বাস করবেন। হোয়াইট গেটস্ বিক্রী হবে।

ইবার্ট ব্যাপারখানা শুনলেন ও বুঝলেন। সারাকে যা বললেন, তা হল এই—সেদিন তারিখ ছিল ১লা নবেম্বর, "অল্ সোল্স্ ডে—"। সব প্রেতাত্মা সেদিন পৃথিবীতে চলে আসে স্বর্গ বা নরক থেকে। স্বর্গ থেকে যারা আসে, তারা মানুষের ভালোর চেষ্টা করে নানাভাবে। আর নারকীরা করে পৃথিবীর মাটিতে নারকীয় মজলিস। সে মজলিসের নাম কোভেন। এই কোভেনে যোগ দেওয়ার জন্য তারা জ্যান্ত মানুষকেও প্রলুব্ধ করে বিভিন্ন উপায়ে। বলা বাহুল্য সে-প্রলোভনে যারা মজে, পরিণামে নরকবাসই ঘটে তাদের ভাগ্যে।

ঐ বুড়ীটা ছিল নরকের প্রেত। অ্যাগনেসদের সমুখে নরকের দরজা খুলে দেবার জন্যই তার আবির্ভাব ঘটেছিল হোয়াইট গেটস্-এ। আর তার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন সারা ক্লেবার্ণ।

এডিথ হোয়ার্টন-এর "অল্ সোল্স" অবলম্বনে

করতে পার

যদি তোমায় কেউ পাশের তারার মত ছক কেটে বলে যত কম সরল রেখায় পার তারাগুলি যোগ কর তাহলে দেখবে পাঁচটি বা ছটি রেখার কমে এ কাজ হচ্ছে না। যদি তার চেয়ে কমে না পার তাহলে ১২৫ পৃষ্ঠায় দেখ।

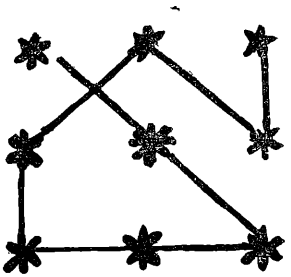

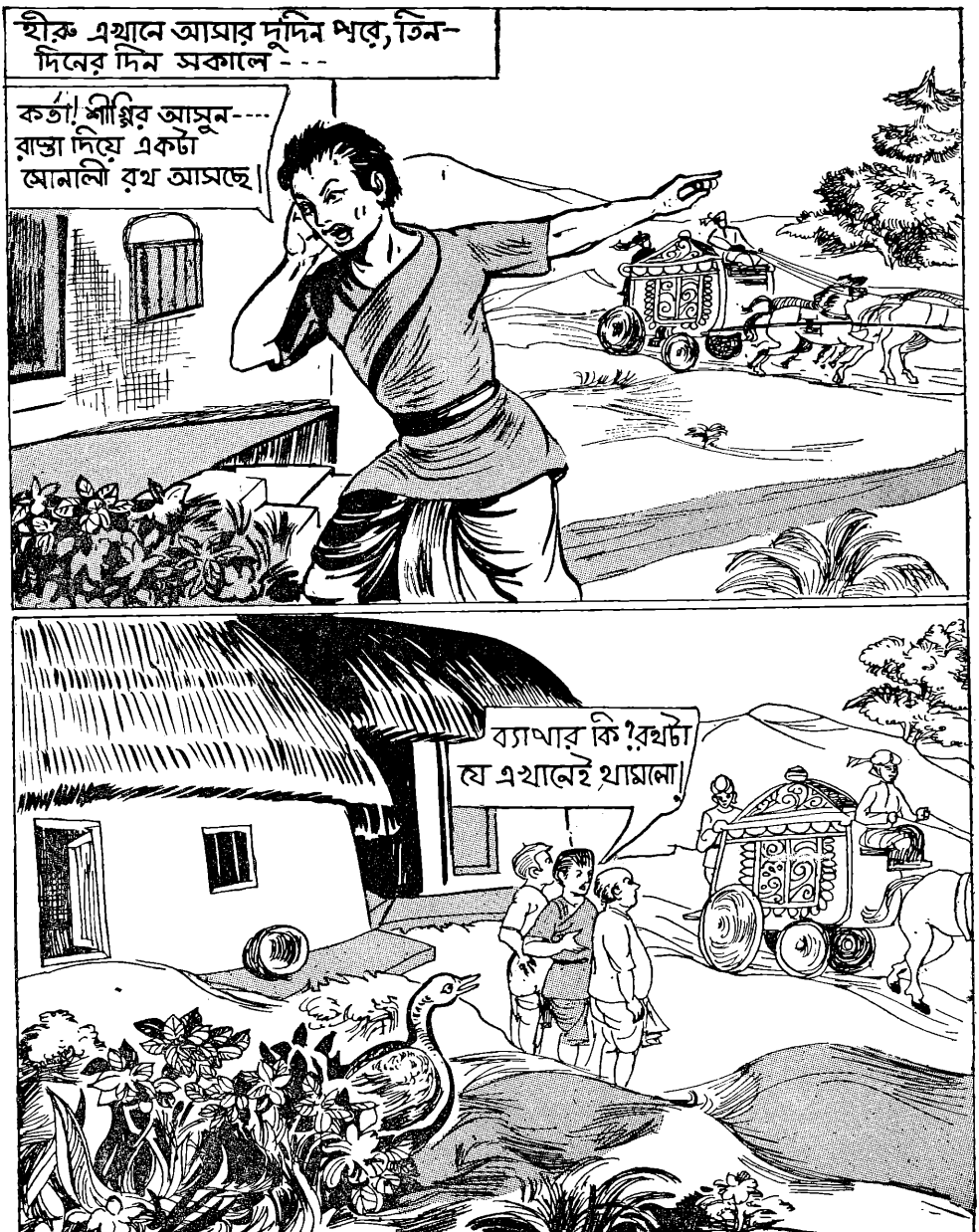
হীরু এখানে আসার দুদিন পরে, তিন-দিনের দিন সকালে---
কর্তা! শীগ্গির আসুন---- রাস্তা দিয়ে একটা সোনালী রথ আসছে!
ব্যাপার কি?রথটা যে এখানেই থামলো!

খুব সুন্দর এক রাজকন্যা রথ থেকে নামলো।
নমস্কার মহাশয়।
নমস্কার রাজ কন্যা। আপনি এখানে কি জন্যে এসেছেন জানতে পারি কি?
ঐ বোকা হতচ্ছাড়া ছেলেটা মুরগীর ঘরে আছে। ওর সঙ্গে দেখা করে কি হবে? আপনি বরং আমার বড় কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।
আমি হীরুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ও কোথায় আছে বলতে পারেন?

না--না--!
আমি হীরুর
সঙ্গেই দেখা
করতে চাই।
রাজকন্যা মুর্গীর ঘরে গেল
হীরু, দেখ-আমি প্রতিজ্ঞা মত ঠিক
তিনদিন পরে এসেছি। তোমার ঘোড়াও
সঙ্গে করে এনেছি।

কিন্তু তুমি কে? আমার সেই বন্ধু পুষ্যি বিড়াল কোথায়?
আমিই সেই পুষ্যি বিড়াল। ডাইনীর যাদুতে আমরা বিড়াল হয়ে ছিলাম। তুমি সত্যিকার বীরের মত, সাত বছর আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে ডাইনীর যাদু নষ্ট করে দিয়েছ। তাই আমি, আমার দাসদাসীরা আবার মানুষ হয়েছি।
শুনে খুব খুসি হলাম। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?
কেন করব না! এতো খুব সুখের কথা।

(চলবে)

মেডিনা

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জোনকে সবাই ভালবাসে। সকলের মুখেই জোনের কথা। গ্রীক দেশের রাজপুত্র জোন। তার বীরত্বের কথা, সাহসের কথা প্রজাদের ঘরে ঘরে। জোন পিতৃহীন। শৈশবেই তার পিতৃবিয়োগ হয়। প্রজারা উপায় না দেখে জোনের কাকা মিঃ মেরিনকে রাজা করেন। তাদের আশা একদিন জোন বড় হবে, বীর হবে, পিতার মত সাহসী হবে। সেই দিনই তাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেবেন।

রাজা মেরিন এ খবর জানতেন। কাজেই প্রজাদের মুখে জোনের প্রশংসার কথা শুনলে, তাঁর ভয় হয়। প্রজারা যদি সত্যিই জোনকে রাজা করেন, তার প্রতিবাদ করবার কোন শক্তিই থাকবে না। রাজা জোনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন।

রাজার ইচ্ছে নয় জোন রাজা হয়। তিনি জোনকে সরাবার জন্য নানান বুদ্ধি বের করতে লাগলেন। কিন্তু কোনটাই তাঁর পছন্দ হলো, না যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে এমনি কাজ তাকে করতে হবে। ভেবে ভেবে তিনি একটা বুদ্ধি বার করলেন। তিনি জোনকে ডেকে পাঠালেন।

রাজা ডাকছেন শুনে জোন ছুটে এলো। জোন হাত জোড় করে কাকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

রাজা বললেন, তোমাকে আমি ডেকেছি জোন! তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। তোমার কি সময় হবে জোন?

জোন কাকার কথা শুনে অবাক্ হলো। তার এমন ধারা কথাবার্তা সে শোনে নি। সে ভাব চেপে রেখে বলল, আমি প্রস্তুত মহারাজ।

রাজা বললেন, আমি ডেকেছি কেন জান?

জোন বললো, না, মহারাজ।

রাজা বললেন, তবে শোন! আমার কাছে খবর এসেছে তুমি খেলাধুলো করে সময় নষ্ট করছো। আমার ইচ্ছে নয় তুমি এভাবে চল। কারণ তুমি বড় হয়েছ। আমি চাই এই রাজ্যের ভার তোমাকে দিয়ে আমি অবসর নেব। আমি এখন বৃদ্ধ। শরীরের শক্তি আগের মত নেই। আগের মত খাটতে পারি নে। তাই তোমাকে রাজা করতে চাই। কিন্তু—

জোন অবাক হয়ে কাকার মুখের দিকে তাকালো। বললো—কিন্তু কী মহারাজ?

রাজা বললেন, কিন্তু হলো, প্রজারা চাইবে তোমার বীরত্ব, তোমার সাহস। তারা বুঝতে চাইবে, তুমি রাজা হলে তারা নিশ্চিন্তে রাজ্যে বসবাস করতে পারবে। তুমি কি পারবে সেই পরীক্ষা দিতে? তোমার উপর আমার আশা অনেক। কারণ তুমি হলে আমাদের বংশের একমাত্র সন্তান। তুমি যদি খেলা করে বেড়াও, তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে।

জোন বললো, আপনি যা আদেশ দেবেন মহারাজ, আমি তাই করবো।

আমি প্রস্তুত মহারাজ।　[পৃষ্ঠা ১০৬

রাজা হাসলেন, বললেন, তুমি কি প্রজাদের কাছে পরীক্ষা দেবার সাহস রাখ জোন? যদি পার প্রজারাও খুশী হবেন, আমিও রাজ্যভার তোমাকে দিয়ে অবসর নেব। তোমার পিতৃরাজ্য তোমাকে দেব।

জোন বললো, আপনি আদেশ দিলে পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত আছি।

রাজা বললেন, শুনে খুশিই হয়েছি জোন। তুমি দাদার মতনই কথা বলেছ। কিন্তু—

কিন্তু আবার কেন—মহারাজ।—জোন বলল।

রাজা মনে মনে খুশী হলেন। কিন্তু মুখে বললেন, কাজটা খুব কঠিন জোন। তাই মনটা চাইছে না।

জোন বললো, কাজ যতই কঠিন হোক মহারাজ, আমি ভয় পাইনে। আপনি বলুন?

রাজা বললেন, চীন দেশে আমার এক বন্ধু রাজা আছেন। তাঁর বনে গোল্ডেন ফেলেস আছে। তুমি যদি সেই গোল্ডেন ফেলেস আনিয়ে আমাকে দিতে পার—তোমাকে আমি রাজা করে দেব। প্রজারাও তোমার বীরত্বে খুশী হবে।

জোন বললো, আপনি যাবার ব্যবস্থা করে দিন, আমি যাব।

রাজা বললেন, থাক, না যাওয়াই ভাল।

জোন বললো, কেন! মহারাজ?

রাজা বললেন, সেটা আনতে গেলে বিপদে পড়বে। এমনি কি প্রাণ যেতে পারে। তাই মন সায় দিচ্ছে না। একটা ড্রাগন সেই বন পাহারা দিচ্ছে। ফেলেস যে আনবে তাকেই খেয়ে ফেলবে। বুঝলে।

জোন বললো, আপনি চিন্তা করবেন না কাকা! আমি যাব!

রাজা বললেন, বেশ! তবে প্রস্তুত হও গে।

জোন চীনদেশে রওনা হলো। সমুদ্রে জাহাজ ভাসলো। দুই মাসের উপযোগী খাদ্য, লোক-জন সঙ্গে দেওয়া হলো! জোন যে দিকে চাইছে শুধু জল দেখছে। তার মনে হচ্ছে আকাশ-জোড়া বড়াই রয়েছে, তার মধ্যে জল ফুটছে টগবগ করে। উপরে নীচে শুধু নীল আকাশ। তারা যেন আকাশের হাতে বন্দী। স্থল নেই জীবজন্তু নেই। এমন কি একটা পাখিও নেই।

এক নাগাড়ে কুড়ি দিন চলবার পর জাহাজ এসে চীনদেশে ভিড়লো। সুন্দর দেশ। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়। জোন অবাক্ হয়ে দেখলো। ছবির মত রাস্তা-ঘাট। চকচকে ঝকঝকে সব বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট ছোট ফুলের বাগান। জোন তার কাকার চিঠি নিয়ে চললো রাজপ্রাসাদে।

রাজা তখন দরবার করছিলেন। পাত্র-মিত্র প্রজারা রাজাকে ঘিরে রেখেছে। সেখানে এসে জোন উপস্থিত হলো। জোন তার কাকার চিঠিটা রাজার হাতে দিল।

রাজা চিঠিটা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা। আমার বড় ভাইয়ের ছেলেকে পাঠালাম গোল্ডেন ফেলেস আনতে। সে যেন ফিরে না আসে, তার ব্যবস্থা করবেন। ইতি মরিশন গ্রীকরাজ।

চিঠি পড়ে রাজা জোনকে নিজের কাছে ডাকলেন। গটগট করে হেঁটে জোন এসে দাঁড়ালো রাজার সামনে। সৌম্য শান্ত লাবণ্যময় একটি যুবক। নির্ভীক চেহারা।

রাজা বললেন, তুমি জোন! গোল্ডেন ফেলেস নিতে এসেছ?

জোন বললো, হ্যাঁ, মহারাজ।

রাজা বললেন, ওখানে কেউ যেতে পারে না, ড্রাগন পাহারা দিচ্ছে। গেলেই খেয়ে ফেলবে।

জোন বললো, জানি, মহারাজ।

রাজা একটু অবাক্ হলেন, বললেন, জেনে-শুনে তুমি যাবে?

জোন বললো, হ্যাঁ! মহারাজ। এ ছাড়া আমার উপায় নেই। এর জন্যই গ্রীক দেশ ছেড়ে এখানে এসেছি।

রাজা তার বীরত্বব্যঞ্জক কথাবার্তা শুনে খুশী হলেন। কিন্তু রাজা মন্ত্রিশনের চিঠি তো অমান্য করতে পারেন না। তাই তিনি বললেন, গোল্ডেন ফেলেস তোমাকে আমি পাইয়ে দেব। কিন্তু তার আগে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে—জোন!

জোন বললো—কি কাজ! মহারাজ?

রাজা বললেন—আমার একটা ষাঁড় আছে। তাকে দিয়ে মাঠে চাষ করাতে হবে। তারপর এই লোহার দাঁতগুলো মাটিতে বুনে দিতে হবে। কেমন পারবে তো?

জোন বললো, রাজি মহারাজ। আমাকে ছাড়পত্র দিন।

রাজা বললেন, ওখানে গিয়ে বস। বীজ আর ছাড়পত্র দুই পাবে।

জোন রাজাকে প্রণাম করে গিয়ে দূরে বসলো।

একটু পরেই বীজ আর ছাড়পত্র দুই পেলো জোন। এই দুটো নিয়ে যখন রাস্তায় বের হয়ে পড়লো জোন তখন সন্ধ্যা। চিন্তিত মনে জাহাজে ফিরে যাচ্ছিলো সে। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক এসে তার পথ আটকালো। জোন থমকে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি হাত জোড় করে বললো, হুজুর! আমি এই দেশের রাজকন্যা মেডিনার আয়া। তিনি রাজদরবারে ছিলেন। আপনার সব কথা তিনি শুনেছেন। ঐ ষাঁড়কে দিয়ে কেউ চাষ করাতে পারে না। ভীষণ রাগী। অসম্ভব শক্তি। ওর কাছে গেলেই গুঁতিয়ে মেরে ফেলবে। আর গোল্ডেন ফেলেস আনা তো একেবারেই কল্পনার বাইরে। সেখানে দিনরাত ড্রাগন পাহারা দেয়। আপনি যদি মেডিনার কথা মত চলেন, তিনিই আপনাকে সাহায্য করবেন। ষাঁড় দিয়ে চাষও করাতে পারবেন। গোল্ডেন ফেলেস আপনি পাবেন।

জোন বললো, আমি রাজকন্যার কথা মতো চলবো। আমি কথা দিচ্ছি।

স্ত্রীলোকটি বললো, মেডিনা আপনার রূপে ও সাহসিকতায় মুগ্ধ। যদি তাঁকে বিয়ে করেন তবেই তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

জোন বললো, তোমার এই প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম।

স্ত্রীলোকটি বললো, আপনি ছাড়পত্র নিয়ে গোয়ালঘরে উপস্থিত থাকবেন। সেখানে রাজকন্যার দেখা পাবেন। তিনি যেভাবেই হোক, আপনাকে সাহায্য করবেন। এই কথা বলে স্ত্রীলোকটি চলে গেলো।

জোন খুশী মনে জাহাজে ফিরে গেলো।

ভোরে প্রাতঃরাশ শেষ করে জোন এসে গোয়ালঘরের সামনে দাঁড়ালো। ভিতরে চেয়ে দেখলো বিরাট বড় ষাঁড়। রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। চোখ মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। ষাঁড় দেখে জোনের পীলে চমকে গেল।

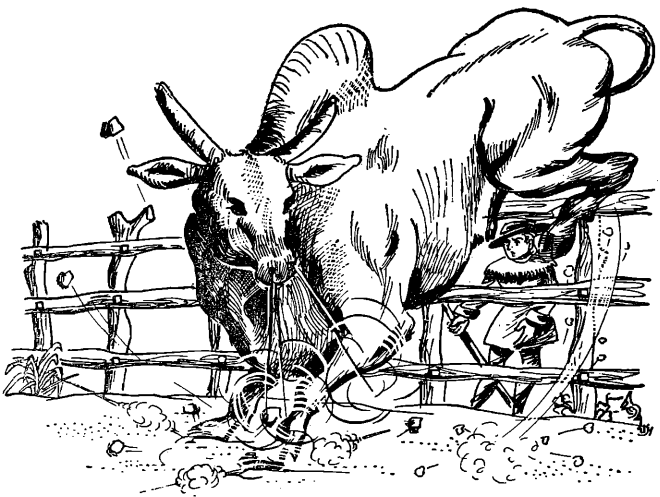

ষাঁড় দেখে জোনের পীলে চমকে গেল। [পৃষ্ঠা ১০৯

এমন সময় মেডিনা এলো। হাতে একবাটি সবুজ রঙের তরল পদার্থ। মেডিনা নিজের পরিচয় দিল। বলল,—ষাঁড়টার গায় বিশজন মানুষের শক্তি। তার রাগও সর্বদা লেগেই আছে। ওর ধারে গেলেই গুঁতিয়ে মেরে ফেলবে। আজ পর্যন্ত ওকে কেউ বশ করতে পারে নি। যে যায় তারই মৃত্যু হয়।

জোন হতাশ হয়ে মেডিনার দিকে চাইলো। মেডিনা বললো, ভয় নেই। তুমি এক কাজ কর, এই সবুজ পদার্থটা খেয়ে নাও, তাহলে তুমি ষাঁড়ের চেয়ে শক্তিশালী হবে। আর এই তেল ওর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলে ষাঁড়ের তেজও কমে যাবে। তখন তুমি ওকে দিয়ে যে কোন কাজ করাতে পারবে।

জোন সব শুনে কোন প্রকার দ্বিধা করলো না। মেডিনার হাত থেকে তরল পদার্থটা নিয়ে, এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো সে অসীম শক্তিশালী হয়েছে। মেডিনা তেলের বাটিটা জোনের সামনে এগিয়ে দিল। জোন তেলের বাটি নিয়ে ষাঁড়ের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল। ষাঁড় নিস্তেজ হয়ে পড়লো। জোন তাকে ধরে মাঠে নিয়ে গেল। ষাঁড়কে দিয়ে চাষ করালো। শেষে লোহার দাঁতগুলো মাটিতে বুনে দিল।

দেখতে দেখতে মাটি ফুটে হাজার দৈত্য বের হয়ে এলো। তারা জোনের দিকে ছুটে এলো। মেডিনা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললো, জোন, দাঁড়িয়ে থেকো না। শীগগির শীগ্‌গির তুমি ঢিল ছোড়। নইলে আমাদের রক্ষা নেই।

জোন তাড়াতাড়ি ঢিল ছুড়তে লাগলো। দৈত্যরা ছিল বোকা। তারা ভাবল তাদেরই

লোকেরা ঢিল ছুড়ছে। তাই তারা রেগে নিজেদের লোককেই আক্রমণ করলো। দৈত্যদের মধ্যে আধ ঘণ্টা যুদ্ধ হলো। শেষে সব দৈত্যরাই মরে গেল নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। জোন আর মেডিনা বেঁচে গেল।

মেডিনা বললো, এখানের কাজ শেষ হয়েছে। এখন চল গোল্ডেন ফেলেস নিয়ে আসি। তা হলেই তোমার কাজ শেষ।

দু'জনে গিয়ে বনে ঢুকলো। যেখানে ফেলেস সেই জায়গা আলো হয়ে আছে। গোল্ডেন ফেলেসের কাছে বসে আছে ড্রাগন।

জোন কখন ড্রাগন দেখেনি। ওর ভীষণ চেহারা দেখে জোন ভয় খেয়ে গেল। সে মেডিনার দিকে তাকালো। মেডিনা বললো, ভয় নেই, চল এগিয়ে যাই।

দু'জনে ড্রাগনের দিকে এগিয়ে গেল। ওদের দেখে ড্রাগন গর্জন করে তেড়ে এলো।

মেডিনা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তার ঝোলার ভিতর কেক ছিল। সে জানত ড্রাগন কেক খেতে ভালবাসে। তাই কেকের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে এনেছিল। ড্রাগন তেড়ে আসতে মেডিনা ড্রাগনের দিকে একটি কেক ছুড়ে দিল। কেক দেখে ড্রাগন খুশী হয়ে গপাগপ খেয়ে নিলো। তারপরই সে গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লো।

মেডিনা বললো, ড্রাগন ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি শীগগির যাও গোল্ডেন ফেলেস নিয়ে এসো। দেরি করো না।

জোন ছুটে গিয়ে ফেলেস নিয়ে এলো। মেডিনার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। চল জাহাজে ফিরে যাই।

দু'জনে ছুটতে ছুটতে জাহাজে গিয়ে উঠলো। জাহাজ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। দু'জনে উঠতে ছেড়ে দিল। চীনের রাজা যখন জানতে পারলেন, জোনরা তখন সমুদ্রের মাঝখানে।

যথাসময়ে নিজের দেশে গিয়ে পৌঁছল জোন। রাজা মরিশন খবর পেলো জোন গোল্ডেন ফেলেস নিয়ে এসেছে। প্রজারাও খবর পেলো। সকলে এসে জোনের সঙ্গে দেখা করলো। জোন তার কাকার দুষ্টুমির কথা প্রজাদের জানালো। কাকা তাকে মারবার জন্যই চীন দেশে পাঠিয়ে ছিলেন। মেডিনার জন্যই সে বেঁচে ফিরে এসেছে।

প্রজারা সব শুনে রাজার উপর চটে গেল। তারা রাজা মরিশনকে সিংহাসন হতে নামিয়ে জোনকে রাজা করে দিলো। মেডিনা হল রানী। তারপর তাঁরা সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলো।

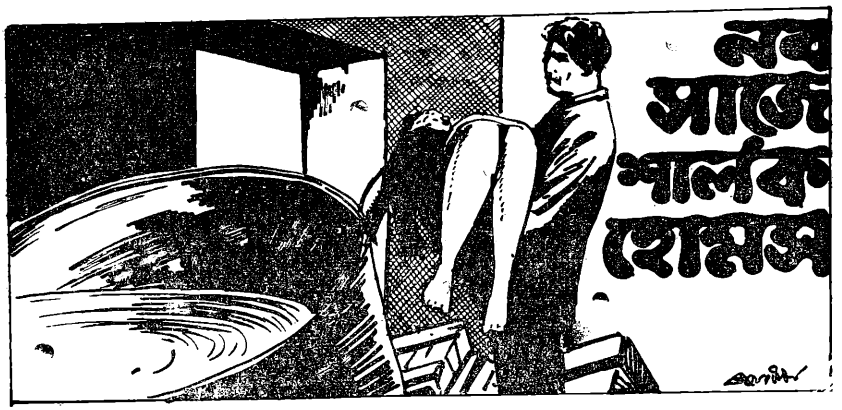

শৈলেশ ভড়

তাঁর আসল নাম ডক্টর কিম সিম্পসন। বিশ্ববিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফোরেনজিক ল্যাবরেটারীর বিশ্ববিখ্যাত এক্সপার্ট। সবাই বলে বিংশ শতাব্দীর শার্লক্ হোম্‌স্।

কথাটা কিন্তু একটুও মিথ্যে নয়। তাঁর তদন্ত পদ্ধতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অনুসন্ধিৎসু মনকে প্রত্যেকটি আসামী রীতিমত সমীহ করে।

'আপনি কি বলছেন ডঃ সিম্পসন?' গোঁপে তা দিয়ে বললেন দুর্দান্ত খুনী জন হেগ—'আমি বিধবা বৃদ্ধা শ্রীমতী ডুরাণ্ড ডিকন্‌কে খুন করেছি। ছি ছি এমন একটা অবিশ্বাস্য কথা আপনার মুখ দিয়ে বেরোলো কা করে?'

'তা জানি না।' রীতিমত গম্ভীরভাবে বললেন ডঃ সিম্পসন, 'আমার বিশ্বাস এ আপনারই কাজ।'

'কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়?' ডানদিকের ঠোঁটটা কুঁচকে তাচ্ছিল্যভরে হাসলেন জন হেগ, 'মৃতদেহ না পেলে আপনি আমার কিছুই করতে পারবেন না।'

'তা ঠিক, মৃতদেহ আবিষ্কৃত না হলে হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়।'

'অতএব আপনার ঐ কুৎসিত চাউনিটা আমার ওপর থেকে সরিয়ে দয়া করে আর কারোর উপর ফেললে ভাল হয় না কি?'

'হুঁ!' খুনী হেগের চোখে চোখ রেখে বললেন ডঃ সিম্পসন, 'কিন্তু শ্রীমতী ডিকনের মূল্যবান গহনাগুলো আপনি যে সেঁকরাকে বিক্রি করেছেন সেগুলো আমাকে দেখিয়েছে। অতএব আমার কুৎসিত চাউনিটা বর্তমানে আপনার ওপরেই পড়ে থাকবে।'

একটু চমকালেন জন হেগ। বিস্ফারিত হাসিটাও একটু কুঞ্চিত হলো যেন, 'সত্যি আপনার বুদ্ধি আছে ডঃ সিম্পসন। শহরের এতগুলো সেঁকরার মধ্যে থেকে ঠিক আসল লোকটিকেই ধরেছেন। কিন্তু কী করে ধরলেন, বড় জানতে ইচ্ছে করছে।'

'যেমন করে আপনাকে ধরেছি, ঠিক তেমনি ভাবে। আসল কথাটা কি জানেন? ঈশ্বরের পৃথিবীতে দুষ্টু লোকের সংখ্যা খুব কম, তাই তাদের চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না।'

'কিন্তু গয়না চুরি করে বেচে ধরা পড়লে কয়েক মাস অবশ্য জেল হতে পারে। সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু হত্যাকারী বলে প্রমাণিত হলে নির্ঘাৎ ফাঁসি। ওতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে।'

'আপত্তি থাকলে তো চলবে না জন হেগ। হত্যাকারীকে ফাঁসিতে লটকাতেই হয়। দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে এ ছাড়া আর উপায় কী?'

'মৃতদেহ না পেলে আপনি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। আর সে মৃতদেহ আপনি জীবনে খুঁজে পাবেন না।'

'হ্যাঁ সেটা আমি জানি। কারণ—' কথাটা বলে থামলেন ডঃ সিম্পসন। চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে হেগের দিকে।

হেগের দৃষ্টিটা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো এবং কপাল ও ভ্রূজোড়া দুইই কুঁচকে উঠলো, 'কারণ?'

খুব ধীরে ধীরে বললেন ডঃ সিম্পসন, 'কারণ আপনি তাকে সালফিউরিড অ্যাসিডে ফেলে একেবারে গালিয়ে ফেলেছেন।'

'কে, কে বলেছে একথা?' চেয়ার ছেড়ে তীরের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন জন হেগ।

'যার কাছ থেকে আপনি অ্যাসিডের ড্রামটা কিনেছেন সেই বলেছে।' এবার ডঃ সিম্পসনের গম্ভীর মুখে ছোট্ট একটু হাসি ফুটে উঠলো, 'এই মারাত্মক অ্যাসিডে লোহাও গলে যায়।'

'তা-তা-তাতে কি হয়েছে?' একটু তোৎলালেন জন হেগ, 'ও অ্যাসিড আমার অন্য কাজে লাগতে পারে না। মৃতদেহ গালিয়ে ফেলবার জন্যে কিনেছি তার কি মানে আছে?'

'মানে কি জানেন মিঃ হেগ?—' ডঃ সিম্পসন কথা দিয়ে চিমটি কাটলেন, 'বুঝতে চাইলে সব কথারই মানে পাওয়া যায়, আর তা না চাইলে—'

'আপনি কী বলতে চান ডঃ সিম্পসন?' পকেটে একটা হাত পুরে একটু এগিয়ে এলেন জন হেগ। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমি ডিকনকে খুন করেছি।'

'আমি বলবো কেন, আপনি নিজেই বলুন।'

'না, আমি খুন করিনি।'

'হাত তোল শয়তান হেগ।'

'আপনার গলার আওয়াজ আগের চেয়ে এখন অনেক নরম হয়ে এসেছে। কিন্তু আমার কাছে আপনার বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ আছে। এই দেখুন।'

'কি এ দুটো?' বড় বড় চোখে চেয়ে বললেন জন হেগ, 'মনে হচ্ছে খুব ছোট ছোট দুটো গুলি।'

'সাদা চোখে তাই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন এ দুটো মানুষের দেহের গল্‌ড স্টোন। পুরু চর্বিতে ঢাকা আছে বলে অ্যাসিডে গলে নি। মিসেস ডিকনের চিকিৎসক বলেছেন যে তাঁর গল্‌ড স্টোন ছিল।'

'তা থাকতে পারে।' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন জন হেগ, 'কিন্তু এ দুটো যে তাঁরই তার কি প্রমাণ?'

'না, তা অবশ্য নেই।' খুব শান্ত গলায় বললেন ডাঃ সিম্পসন। 'কিন্তু এই বাঁধানো দাঁতের পাটিটা যে তাঁর সেটা চিহ্নিত করেছেন তাঁর দাঁতের ডাক্তার। এটা পুরো গলে নি কিন্তু অ্যাসিডের ছাপ পাওয়া গেছে। অতএব—'

গলা ছেড়ে এবার হেসে উঠলেন জন হেগ, 'সত্যি আপনার তদন্তের প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঠিক লোককেই আপনি ধরেছেন। হ্যাঁ, আমি তাকে পিছন থেকে গুলি করে মেরে তারপর সালফিউরিক অ্যাসিডের ড্রামে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু না। আপনাকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না।'

হেগ পকেট থেকে পিস্তলটা বার করবার আগেই আর একটি পিস্তল তার কাঁধের কাছে ঠেকিয়ে পুলিস ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'হাত তোল শয়তান হেগ।'

আর পকেট থেকে একটি ছোট্ট বাক্স বার করে ডঃ সিম্পসন বললেন, 'এতে ধরা আছে আমাদের কথাবার্তা আর আপনার স্বীকারোক্তি।'

তারপর হেগের কী হল সে কথা বোধ করি আর বলবার দরকার নেই।

আর একটা ঘটনার কথা বলি।

একবার দড়িতে বাঁধা একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল সাগরের জলে।

সকলেই বললে এ হত্যা ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

কিন্তু ডঃ সিম্পসন মৃতদেহ পরীক্ষা করে তাঁর মত দিলেন, 'এ আত্মহত্যা।'

'হতেই পারে না।' তীব্র প্রতিবাদ করলেন পুলিস সুপার, 'আপনি আরও ভালো করে পরীক্ষা করুন। এটা নিশ্চয়ই হত্যা।'

'না, এটা আত্মহত্যা।'

'কি করে বুঝলেন?'

'লক্ষ্য করে দেখুন। দেহটিতে যেভাবে দড়ি জড়ানো রয়েছে সেটা নিজে ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রন্থির প্রত্যেকটি মুখ উপর দিকে। মুখ দিয়ে সে গেরো বেঁধেছে। ওর দাঁতের ফাঁকে আমি এই দড়ির একটা টুকরো পেয়েছি। এ হত্যা নয়, আত্মহত্যা।'

আরও অনুসন্ধান করে পুলিস জানতে পারলো লোকটি ব্যক্তিগত কোন কারণে আত্মহত্যা করেছে। অন্ততঃ তার হাতের লেখা ডায়রী সেই কথাই বলছে।

সাধে কি ডঃ সিম্পসনকে বিংশ শতাব্দীর শার্লক হোম্‌স্ বলে।

এবার তাঁর প্রথম জীবনের একটি মজার ঘটনার কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ করবো।

ডঃ সিম্পসন তখন সবে ফোরেনজিক ল্যাবরেটরীতে যোগদান করেছেন।

এমন সময় একটি মহিলার মৃতদেহ এলো তাঁর কাছে পরীক্ষার জন্য।

তিনি বললেন, 'একে গলা টিপে হত্য করা হয়েছে।'

আরও বললেন, 'যে হত্যা করেছে তার হাতের আঙুলের ডগাগুলো সব কাটা।'

সকলেই বললে, 'এ কাজ নিশ্চয়ই হ্যারল্ড লফ্যানের। আর তার হাতের আঙুলের ডগাগুলো সব কাটা। সেই হত্যা করেছে এই মেয়েটিকে।'

কিন্তু স্যার বার্নার্ড সিম্পসন বেরি একজন অভিজ্ঞ পরীক্ষক। তিনি লফ্যানের আঙুলগুলি পরীক্ষা করে মত দিলেন, 'এর পক্ষে হত্যা করা একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ এর হাতের আঙুলে এমন জোর নেই যা দিয়ে গলা টিপে খুন করা যায়।'

বিচারে মুক্তি পেলেন হ্যারল্ড লফ্যান।

ডঃ সিম্পসন তখনও বললেন, 'এ নিশ্চয়ই লফ্যানের কাজ।' কিন্তু স্যার বার্নার্ডের কথার ওপর আর কোন কথা চলে না।

ফাঁসির দড়ি লফ্যানের গলার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর আরও কুড়ি বছর কেটে গেছে। লোকে ভুলে গেছে সেই হত্যার কথা।

এমন সময় লফ্যানের একটি চিঠি নিয়ে একটি লোক এলো ডঃ সিম্পসনের কাছে।

'কি ব্যাপার।'

'লফ্যান ক্যান্সার হাসপাতালে বর্তমানে শয্যাশায়ী। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।'

ডঃ সিম্পসন এলেন হাসপাতালে, বসলেন লফ্যানের শয্যাপার্শ্বে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন তার সুস্থদেহ।

শুকনো হাসলেন লফ্যান, বললেন, 'এবার আমার নরকে যাবার সময় হয়েছে। তার আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যেতে চাই।'

'বলুন।'

'কুড়ি বছর আগে হোটেলের যে মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল তার হত্যাকারী এই আমি। সেদিন আপনি ঠিক লোককেই ধরেছিলেন।'

'কিন্তু স্যার বার্নার্ড বলেছিলেন যে আপনার আঙুলে এত জোর নেই যে গলা টিপে হত্যা করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ সেটাও ঠিক। আমার হাতে সত্যি কোন জোর নেই।'

'তাহলে?' ডঃ সিম্পসন যেন একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

হাসলেন লফ্যান, বললেন, 'আচ্ছা, আপনিই বলুন, ধীর স্থিরভাবে চুরি করবার সময় পিছন থেকে যদি কেউ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে তাহলে কী বিশ্রী লাগে বলুন তো। তাই রেগে গিয়ে—আর রাগলে এই হাত দিয়ে আমি আকাশের বজ্রও চেপে ধরতে পারি। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এই আঙুল দিয়ে আমি একটা পিঁপড়েও মারতে পারি না।'

কথায় শেষে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন লফ্যান।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ডঃ সিম্পসন হাতটি চেপে ধরে করমর্দন করলেন। বললেন, 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। কারণ আমার এই দীর্ঘ কর্মজীবনে কোনদিন কোন ভুল হয়নি। কেবল এই ঘটনাতে একটু সন্দেহ ছিল আজ তাও মিটলো। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

এবার তোমরাই বলো বিশ্ববিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশ্ববিখ্যাত ডঃ কিথ সিম্পসনকে নবসাজে শার্লক হোম্‌স্ বলবে কিনা।

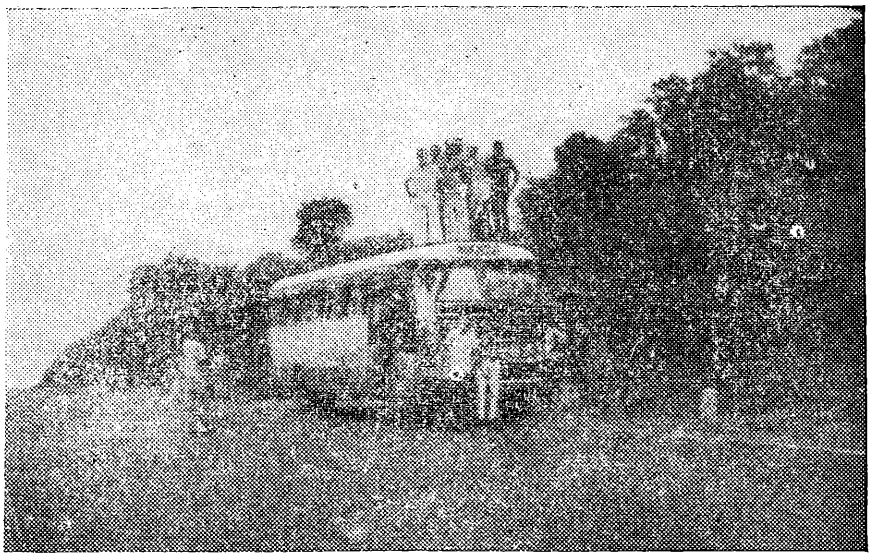

ব্রতচারীদল নেতারহাটের পথে

বিষ্ণুদবারের গেরো !!

সবিতা ঘোষ

কলকাতায় দুর্গাপূজো সেরে একাদশীর দিন সকাল বেলাই টুরিস্ট বাসে করে রাঁচি ট্রিপ দেওয়া হবে ব্রতচারী দলের সঙ্গে! মহানায়ক অমুজীর ব্যবস্থাপনায় জন চল্লিশ লোক যাব।···

নবমী থেকে আবহাওয়া খারাপ হল। দশমীর ভোর থেকেই সাইক্লোন শুরু। যত বেলা বাড়ে, ঝড়ের তাণ্ডবও তার সঙ্গে বেড়েই চলে। সন্ধ্যে থেকে সমস্ত রাত্রি ভয়াবহ ঝড়বৃষ্টি। ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে আর কি! সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় কাটল। কাল সকালেই যাবার কথা। কিন্তু কি করে সম্ভব, এই ঝড়জল মাথায় করে?···

রাত্রি নটায় অমুজী ফোন করলেন—"উমাদি, গোছগাছ সব ঠিক তো? কাল সকাল সাতটায় রওনা দেওয়া।" আমি আমতা আমতা করে বললাম—যদি সাইক্লোন না থামে?" —"আরে, না না। ও কিছু নয়। ঝড় তো থেমেই এল। ড্রাইভারের সঙ্গেও ফোনে এইমাত্র কথা হয়েছে। চা আর সামান্য কিছু খেয়ে নেবেন। খড়গপুরে ব্রেকফাস্ট। জামসেদপুরে শঙ্করজীর বাড়ি লাঞ্চ। আর বিকেলে ঘাটশিলায় ফুলটুংরীতে চা পাহাড়ের ওপর! আ—:, যা জমবে না!" মনে মনে ভাবলাম—কি লোক রে বাবা! এই সাংঘাতিক

সাইক্লোনকে পাত্তাই দিচ্ছে না! ব্রতচারীরা যা ডাকাত ছেলেপুলে, কোন কিছুতেই এদের দমানো যায় না।···দেখে শুনে আমারও উৎসাহ ও সাহস ফিরে এল। যাওয়া হবে কি হবে না ভেবে গোছগাছ আধাখামচা করা ছিল। এখন ঝটপট সব গুছিয়ে ফেলা গেল।

বেশ রাত্রি করে শুয়েছিলাম। এক ঘুমে রাত কাবার। ঘড়িতে চোখ পড়তেই দেখি—ও বাবা-বা, পাঁচটা দশ। আর কি? চায়ের জল চাপিয়ে সবাইকে টেনে তুললাম। চা জলখাবারের সঙ্গে বাড়তি কিছু বিজয়ার মিষ্টিটিষ্টি ছিল সব খেয়ে নিশ্চিন্দি। ঘড়ির কাঁটা ধরে সাতটায় সকলের সাজগোজ ফিনিশ! মালপত্র দোরগড়ায় নামিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে অপেক্ষা।···টিংকুর বাবা বললে—"ঐ, বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে···আরে নাঃ, ও তো কৌশিকরা কোথা থেকে ফিরল।" আবার কিছুক্ষণ···ঐঃ, হর্ন। টিংকু দৌড়ে গিয়ে দেখে এসে খবর দিল—"না বাবা, করুণ কাকুরা কোথায় যাচ্ছেন।" অপেক্ষায় অপেক্ষায় সাড়ে সাতটা, আটটা। টিংকুর আর ধৈর্য নেই। বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো লাগিয়ে দিল। বাস এলেই উঠে পড়বে।···একি, নটার ভোঁও যে বেজে গেল! এমন সময় টিংকু অপরাধী মুখে "মা ভিজে গেল" বলে এক পাটি কেডস্ পরা পা তুলে দেখাল। দেখি কেডস্‌টি নোংরাজলে চুপচুপে হয়ে কালি বর্ণ। অন্যটি সাদা ধপধপ করছে। দিলাম এক চড় কষিয়ে।

এমন সময় খবর এল, রাস্তা খারাপ, কালকের ঝড়-জলের দরুন বাস আসতে দেরি হচ্ছে। দশটা নাগাদ এসে পড়বে। কর্তা বললেন—"তাইতো! এক কাপ চা হলে মন্দ হত না।" চেয়ে চিন্তে একটু দুধ এনে এক কাপ করে চা খাওয়া গেল। চা সবে শেষ হয়েছে, মূর্তিমান অমূজী এসে হাজির। চকরা বকরা শার্টে সজ্জিত, এক্‌স্‌কার্শানের পোশাক! বললেন—"ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তা আটকে আছে, ড্রাইভার আসতে পারছে না, ফোন করেছে, সাড়ে বারোটা নাগাদ নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। আপনারা এক কাজ করুন দুপুরের খাওয়াটা চট করে বাড়িতেই সেরে ফেলুন।"···

কোন মতে ডিমসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, ভাতে ভাত করে খেয়ে ফের হাপিত্যেশ! বাইরেটা মেঘলা, বেলা বোঝার উপায় নেই। কাঠ হয়ে বসে আছি। একটু শুলেই শাড়ির ভাঁজ, খোঁপা সব নষ্ট হয়ে যাবে। আশায় আশায় বিকেল কেটে প্রায় সন্ধ্যে! টুটুদের বাবা কখন বেরিয়ে পড়েছেন। টুটু, টিংকুও ঘরে বসে ডালমুটের টিনের তলায় গুঁড়োগাঁড়া আর ঝাল নুন যা পড়েছিল খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। পথে খাবার জন্যে কেনা লজেন্স, বিস্কুট সব শেষ করেছে। বাড়িতে চিনি, মিছরি যা পেয়েছে খেয়েছে। অন্য দিন বেলা একটার আগে ভাত খাওয়া হয় না। আজ এগারোটা না বাজতেই একটু ভাতে ভাত! কখন সব হজম হয়ে গেছে। ব্রহ্মাণ্ড খাই খাই ভাব।

পাশেই অমুজীর বাড়ি। গিয়ে দেখি সেখানে আমার কর্তা হাজির। নরক গুলজার। বিপ্লব, শিবাজী, গোপা, হরিবিলাসজী, মিঠুয়া—সবাই কেমন এলিয়ে পড়েছে। ঝুনু সবাইকে গরম কফির কাপ এগিয়ে দিচ্ছে। আমিও এক কাপ পেয়ে গেলাম। অসীম এক বুক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"হায়রে, এতোক্ষণে ফুলটুংরীতে প্রকাণ্ড পাথরের ওপর বসে চা খাবার কথা ছিল রে!" সকলে হায় হায় করে ডুকরে উঠল। দমেননি শুধু আমার কর্তা আর আনডনটেড অমুজী! অন্ততঃ এদের দেখে বোঝা যাচ্ছে না। আমি ঢুকতেই অমুজী এক গাল হেসে বললেন—"উমাদি, বিষ্যুদবারের গেরো দেখেছেন!"—বললাম—"আহা, বারবেলা তো নয়, ভোরেই তো যাবার কথা ছিল।"—"না না, বিষ্যুদবারটাই আমায় সয় না। আপনারা তো বিশ্বাস করেন না! দেখছেন তো?" আমি বলি, "আপনিই তো পাণ্ডা। এতো বার থাকতে বেছে বেছে এই দিনটি ঠিক করলেন কেন তবে?"—"আহা, তখন কি আর জানি? বরাবরই তো একাদশীর দিন দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সেই মত ঠিক করেছিলাম, বারের খেয়াল করিনি।" বললাম—"যাক্, এখন শেষ খবর কি বলুন।" অমুজী বললেন—"খবর পেলাম, রাস্তায় নয় টুরিস্ট বাসের ওপরই গাছ ভেঙে পড়েছে—বাসখানাও বেশ জখম হয়েছে। তাই আজ আর যাওয়া যাবে না। কাল হবে। আজ বিষ্যুদবার শুনেই আমি প্রমাদ গনেছিলাম। এবার বিশ্বাস হলো তো? গেরো আর কাকে বলে?"...

*　　*　　*

যাই হোক, বৃহস্পতিবার আমাদের যাওয়া হয়নি। তাই বলে কী রাঁচী যাবার প্ল্যান ছেড়ে দিলাম। ঐ বেয়াল্লিশটি ছেলেমেয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরে ফিরে গেল? তা নয়! শুক্রবার সকাল থেকে গতকালের পুনরাবৃত্তি। সেই চা খেয়ে তৈরী হওয়া। আমাদের আর অমুজীর বাড়িতে পাঁচ ছটি ছেলেমেয়ে রাত্রে থেকে গিয়েছিল।

*　　*　　*

সকাল, দুপুর, বিকেল নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষায় অপেক্ষায় কেটে গেল। পাড়ার লোকে আমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক্। সকলের সহানুভূতি আহা, উহু, গায়ে আরো জ্বালা ধরাচ্ছিল।—"ওমা, উমাদি! কাল সকাল থেকে বসে আছেন এখনো বাস এলো না!!" টুটু, টিংকুর বন্ধুরা ঠাট্টা টিট্‌কারী করছে—"তোদের আর যাওয়া হয়েছে! আজও হাঁ করে বসেই থাকবি। বাস আর তোদের এসেছে!"...

ওদিকে বৌবাজারে ব্রতচারী আফিসে বেশ বড় একটা দল যারা দূর থেকে—কাঁচড়াপাড়া, সোনারপুর, খড়দা, বানীপুর ইত্যাদি থেকে এসেছে—তারা কাল থেকে চিঁড়ে দই খেয়ে, হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। সতীর্থ কোম্পানি চব্বিশ শ' টাকা

আগাম দিয়ে এখন নড়তে চাইছে না। আমাদের ছেলেদের খাঁচায় পোরা বাঘের অবস্থা। তারা আস্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত।

একবার অমুজীর হুকুম পেলেই সতীর্থের ম্যানেজারের গায়ের চামড়া খুলে আনে আর কি! অমুজী আর আমার কর্তার ছোটাছুটি। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যেবেলা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, হাজার দুই টাকা ধার করে চকচকে ঝকঝকে প্রকাণ্ড ডিলুক্স্ ট্যুরিস্ট বাস ভাড়া করে এনে হাজির! বউবাজার পার্টি তাতে সমাসীন! আমরা তড়িঘড়ি বাসে উঠে পড়লাম। অমুজী কি জয় !!

যাক্, স্বস্তি! বিষ্যুদবার তো অনেকক্ষণ কাটিয়ে উঠেছি। এবার সব শুভ। পথে এক জায়গায় বাস থামিয়ে ঠাকুর, চাকর, হাঁড়ি কড়া নেবার কথা। এসে শোনা গেল—কাল থেকে অপেক্ষা করে করে আজ তারা বাসন কোসন সমেত হাওয়া!·· ···এ যে আর এক গেরো। সেরেছে রেঃ! আমরা কজন গিন্নীবান্নি আছি, এখানেও কি শেষে হাঁড়ি ঠেলতে হবে? এই চল্লিশজন ক্ষুদে রাক্ষসদের রান্না কি তবে আমাদেরই করতে হবে? বেস্পতিবারের গেরোর জটটা খুলছে, না আরও একটু একটু করে পাকাচ্ছে?···

অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের চার তারিখের মধ্যে ফিরতেই হবে। আজ পয়লা অক্টোবর রাত্রে যাত্রা শুরু করা হলো। অতএব ঝড়ের বেগে ঘোরা। সমস্ত রাত্রি সাঁ সাঁ করে বাস চলল। সকলের পেটেই ছুঁচোয় হাডুডু খেলছে! রাত্রি সাড়ে বারোটা নাগাদ বাস থামিয়ে এই ক্ষুধার্ত বাহিনী যেখানে গিয়ে দাঁড়ায়—লোকের চক্ষু ছানাবড়া! শেষে পাঁশকুড়োয়—আহা, পাঁশগাদাই বটে—কাদা প্যাচপ্যাচ মাঠে, নোংরা খাটিয়ার ওপর বসে পাঞ্জাবীদের তৈরি রুটি আর তড়কা খাওয়া হলো। পাঞ্জাবী ড্রাইভারদের জন্যেই বিশেষ করে এই সব হোটেল সারা রাত্রি খোলা থাকে। ওরা গরম গরম রুটি সেঁকতে থাকে, আমাদের দল খেতে থাকে।·····"ওঠ, ওঠ, আবার বাসে ওঠ।" অমুজী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়লেন—"পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জায়গায় দেড় ঘণ্টা কেটে গেল।"·····

আমি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখছি না। শুধু, এ যাত্রায় বেস্পতিবারের গেরোটি প্রতিপদে কেমন একটি করে পাক খেয়েছে সেই বলবো। বিষ্যুদবারের গেরোর জের যে কতদূর গড়াতে পারে বোঝা যাবে।

সময়মাফিক সব হলে, ড্রাইভার বললেন—"সন্ধ্যে ছটার মধ্যে নেতারহাট পৌঁছে যাওয়ার কথা। দিনের আলো কমে এলো, ঐ দুর্গম পাহাড়ী পথে ড্রাইভিং উচিত নয়। বিশেষ এই রকম প্রকাণ্ড বাস।" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় নেতারহাট যাত্রা শুরু হল মাত্র। আলো আঁধারি পথে প্রথমটা লাগছিল মন্দ

না। চারধারে গাছপালা, জঙ্গল আবছা হয়ে আসছে। মেঘ কুয়াশা নেমে এসেছে। পথ ক্রমশঃ দুর্গম হচ্ছে। ড্রাইভার অতি সতর্ক। ছেলেমানুষ ছেলেমেয়েরা সবটাই অ্যাডভেঞ্চারের স্পিরিটে নিচ্ছে। আমার বয়স্ক মন বলছে—কি দরকার বাবা, আর এগোবার! এতোগুলো লোকের দায়িত্ব! সাত আট বছরের বাচ্চাও দু' তিনটি সঙ্গে রয়েছে! অন্ধকারে গাছের আকৃতি দত্যিদানার মত, ভূত-পেত্নীর মত লাগছে। সামনে বাসের সার্চলাইটটা পড়ে হাতকয়েক পথ আলোকিত করছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অদ্যই আমাদের শেষ রজনী!…

ও বাবা, সোনায় সোহাগা! বৃষ্টি নামল। ক্রমে মুষলধারায়। রাস্তা যত দুর্গম হচ্ছে, বৃষ্টির বেগ তত বাড়ছে। ঘোর অন্ধকার! টর্চ জ্বেলে জ্বেলে পথনির্দেশক ফলকগুলো পড়তে হচ্ছে। ইংরাজীতে লেখা—'বশান্!' 'ড্রাইভ স্লো' 'ভেরী স্লো!' 'হেয়ার পিন্ বেণ্ড!' রাস্তা এতো খারাপ, এতো সরু, হেয়ার পিন্ বেণ্ড, আর এগোন কিছুতেই সমীচীন নয় মনে হচ্ছে।…অমুজী যেন কী! একবার হুকুম দিলেই ড্রাইভার থেমে যায়! ডাঃ জোসএর দিদিতে আমাতে বলাবলি করছি এরা কি পাগল হয়ে গেল নাকি? এদের কি ভূতে পেয়েছে? আচ্ছা, ড্রাইভারের নিজের প্রাণের মায়াও কি নেই!…আলো ফেলতেই দেখি—মোটা অক্ষরে লেখা—"রোড ব্রোকেন!"

যাক নিশ্চিন্দি। আর এগোন যাবে না।…ওমা, ঐ বিশাল গাড়ি অন্ধের মত তারই ভেতর যেন আত্মহত্যা করতে এগিয়ে চলল! বৃষ্টির বিরাম নেই। উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপার দুটো অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। ভেতর দিক থেকে স্বপন ঝাপসা কাচ গামছা দিয়ে ক্রমাগত মুছে দিচ্ছে।…বেস্পতিবারের গেরো কি আরো পাকাচ্ছে?

রাত নটার পর নেতারহাট পৌঁছে শুনি আমাদের জন্যে কোন ঘর বুক করে রাখা হয় নি। এও বোধহয় বৃহস্পতির কৃপা! সতীর্থ কোম্পানির বুকিংএর কাজটি দিন কয়েক আগেই করে রাখার কথা ছিল। ওঃ, বলতে ভুলেছি রাঁচি থেকে আমাদের সেবায় লাগবার জন্যে কুড়িটি মুরগীও সওয়ার হয়েছেন। তাঁদের স্থান হয়েছে—"ল্যাভেটরী" লেখা খুপরিটিতে! সুতরাং আমাদের প্রকৃতির ডাকে, প্রকৃতির কোলেই ডাইনে, বাঁয়ে মাঝে মাঝে নেমে পড়তে হচ্ছে বাসের খোল ছেড়ে! অনেক কষ্টে একটা নতুন হোটেল 'পঞ্চা য়ৎ'—সবে অর্ধেক তৈরী হয়েছে, আমাদের একটা হল ঘর ছেড়ে দিল রাত্রির মত। বললে—রাত্রি বারোটা নাগাদ ডালভাতের ব্যবস্থাও করে দেবে। আমাদের জনকয় ছেলে—বিপ্লব, অহীন, নরেশ ইত্যাদিরা সেই মাঝরাতে, অন্ধকারমত একটা ঘরে মুরগী ছাড়াতে বসে গেল। সফিকুল—প্রধান শেফ রান্নায় লেগে গেল। আমি এই সব ডানপিটের অদম্য উৎসাহ, আর প্রাণশক্তি দেখে স্তম্ভিত। রাত দেড়টা নাগাদ খানাপিনা, দুটোয় শোওয়া।

ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখতে পালামৌ বাংলার সামনে ভীড় জমালাম, কিন্তু দেখতে পাইনি, দিকচক্রবালে মেঘ ছিল প্রচুর। সেও বেস্পতিবার কলকাটি নেড়েছিলেন কিনা কে জানে? আবার অম্বুজীর গর্জন! মেয়েদের প্রসাধন, গোছগাছ, বিছানা বাঁধ, তল্পি তোল। কাদায় প্যাচর প্যাচর করতে করতে বিশ্বস্ত বন্ধু বাসের কোলে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি—আরে, এ তো সেই কাল রাত্রি থেকে গাড্ডায় পড়ে আছে! সেই গেরোর জের আর কি! তাকে নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি। ড্রাইভার, ক্লীনার, ছেলের দল, ঘাম ঝরিয়ে বহু কষ্টে তাকে তুলল। আমরা উঠে পড়ে আবার রাঁচীর পানে ছুটলাম। ছেলে মেয়েরা উল্লাসে গলা মিলিয়ে গান জুড়ল। "লুচি নন্দিনী, ঘৃতে ভাজিনী…" কীর্তন খুব জমেছিল। মূল গায়েন অবশ্যই শ্রীপ্রবুদ্ধ! ব্রতচারী সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, হিন্দী সিনেমা সংগীত—কিছুই বাদ গেল না। আর এক দল নন-স্টপ্ তাস পিটিয়ে চলল!

এবার রাজরোপ্পা ছিন্নমস্তার মন্দির গন্তব্যস্থল। কেউ যেন মনে না করে আমরা দাঁতে কিছু না কেটে খালি পেটে, ছুটোছুটি করে তিথ্যিধর্মো করে বেড়াচ্ছি। উপযুক্ত অনুপান সহযোগে চাপর্ব, মধ্যাহ্নভোজন পর্ব সবই রাজসিক না হলেও, যথারীতি বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। ছোট ছোট হোটেল একা কুলিয়ে উঠতে না পারলে দল করে করে তিন চারটে হোটেলে ঢুকে পড়া হচ্ছে। ছিন্নমস্তার মন্দিরে, যেখানে বেশ বেলাবেলি পৌঁছে, রাজরোপ্পার অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা, বিশেষতঃ নানা রংয়ের পাথরে পাহাড়ের কোলে কোলে ভৈরব আর দামোদরের নৃত্য দেখার কথা—সেখানে পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যের ছায়া নেমে এল! পথঘাট হারিয়ে, নির্জন ঝোপজঙ্গলে কাঁচা রাস্তায় গাড়ি উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরতে লাগল। গাড়ি চালাবার পথে অত্যন্ত খারাপ রাস্তা, বাসটা নৌকোর মত দুলছে! প্রতিপদে কাদায় আটকাবার ভয়। নয় তো উলটে খানাখন্দে পড়ে রাজরোপ্পা না গিয়ে আমাদের মোরব্বা হয়ে যাবার ভয়! সেই সব জায়গা দিয়ে শম্বুক গতিতে গাড়ি এগোতে এগোতে চোখের ওপর সূর্য ডুবে গেল!

আমি বার বার বলতে লাগলাম ছিন্নমস্তা মাথায় থাকুক—রাঁচী ফিরে যাই। এতো দূরে হতেই পারে না। ভুল পথে কোথায় চলেছি কে জানে? দূর ছাই, এর চেয়ে জাহান্নামে যাওয়াও সোজা।…ধন্যি! ড্রাইভারটির গাড়ি চালাবার দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাস। এর ওপর সমানে গাইডগিরিও করে, পথের দুধারে এটা ওটা দেখিয়ে চলেছেন। আবার কে কখন জানলায় চড়ে বসছে আর আয়নায় দেখে তাকে নামতে বলছেন। এই ক্ষ্যাপাটে দলের সঙ্গে কেন মরতে আসতে গেলুম যখন ভাবছি, ঠিক তক্ষুণি অম্বুজী বললেন—"উমাদি, দেখুন কেমন জ্যোৎস্না উঠেছে। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। এমন শুভলগ্নে আমরা নির্বিঘ্নে ছিন্নমস্তার মন্দিরে ঠিক পৌঁছবই।"

সত্যিই তাই হল। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। আমরা ভৈরব নদীর কোলে ছিন্নমস্তার মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। পাথুরে পথে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে লাফাতে লাফাতে নেমে এসে দামোদর নদ ভৈরবে মিশেছে। অনেকে স্নান করে পূজো দিলেন। এইখানে শুভাশিসের সঙ্গে মা ছিন্নমস্তা একটুখানি রসিকতা করলেন। নাকি বিষ্যুদবারের গেরো তো এখনো সঙ্গ ছাড়েনি, তারই প্যাঁচে সে স্রোতে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল কে জানে!

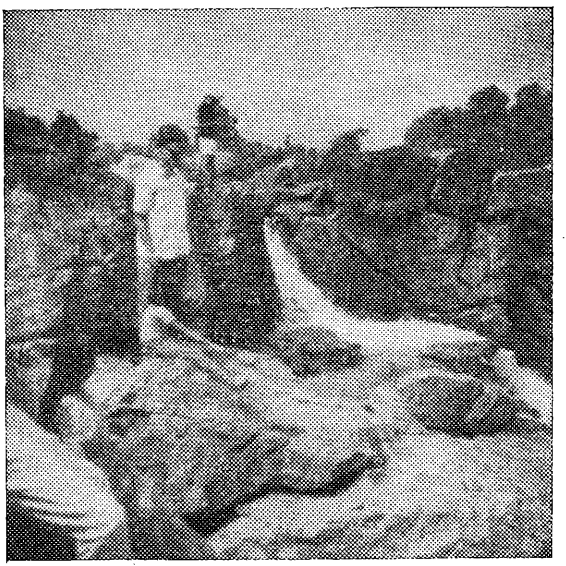

হুড্রু ফল্‌স্ [পৃষ্ঠা ১২৪

সমস্ত দিন বাসে ঘুরে ঘুরে সকলেই হাক্লান্ত অবস্থা। ভাবছি রাঁচীতে, বিমলবাবুর বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা তো হয়েই আছে, কোন গতিকে সেখানে পৌঁছতে পারলে হয়! রাত্রি এগারোটায় সেই বাড়িতে পৌঁছে দেখা গেল গেরো আরো পাকিয়েছে। ঘর আছে, কিন্তু নিরন্ধ্র অন্ধকার। বাড়ি তালা দেওয়া পড়ে ছিল তাই ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে! আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। লোকজন, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকিয়ে লাইন ঠিক করে আলো জ্বালতে গেল আরও এক ঘণ্টা। রাত বারোটায় বাসে করে অমুজীরা হোটেল থেকে খাসা গরম তন্দুরী রুটি ও একটা গ্র্যাণ্ড আলুর তরকারি এনে হাজির করলেন।

একটা মস্ত কথা বলা হয় নি—কারখানা থেকে 'বারবিকিউ' (মুরগী রোস্ট) করার যন্ত্র তৈরি করে বয়ে আনা হয়েছে বাসের মাথায় চাপিয়ে। মুরগীদের অর্ধেক নেতারহাটে সৎকার করা হয়েছে। বাকী দশখানিকে বারবিকিউ করে অর্থাৎ শিক এ গেঁথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগুনে ঝলসে খাবার কথা। মুরগী কেনার সময় কাঠকয়লা পর্যন্ত কেনা হয়েছে। ছেলেরা কি ফেরে যাবে বেস্পতির গেরোর কাছে?…রাত সাড়ে বারোটায় আমাদের নির্দিষ্ট ঘরের কোলের বারান্দাটি যেন শেয়ালদার আমজাদিয়া হোটেলের রান্নাঘরে পরিণত হলো। মাঝখানে ট্রেতে গনগনে কাঠকয়লার আগুন,

চারধার ঘিরে গুটিকয়েক ডাকসাইটে ছে'ল তন্ময় হয়ে মুরগী রোস্টে লেগে গেছে। শেষ পর্যন্ত বারবিকিউ করা মুরগী খেয়ে যখন শুতে গেলাম—তখন বোধকরি তাদেরই জীবিত আত্মীয়স্বজনরা কোঁকোর কোঁ শব্দে রাত্রির শেষ যাম ঘোষণা করছে।···

ভোর পাঁচটা না বাজতে বাজতে আবার ছোট্ ছোট্। এবার বৃষ্টি মাথায় করে, এক সিঁড়ি, এক সিঁড়ি করে হাজার খানেক সিঁড়ি বেয়ে প্রায় পাতালে পৌঁছে গৌতমধারা, ওরফে জোন্‌হা ফল্‌স্ দেখে, হুডরু ফল্‌স্ দেখে ঘর পানে ধাওয়া। হুডরুতে নামবার সময় হলো না। এ দুটো জায়গায় বেম্পতির গেরো আর বিশেষ কিছু সুবিধে করে উঠতে পারে নি···

হুহু করে বাস ছুটেছে। ছেলেমেয়েদের হই-হল্লা, হাসি-তামাশা চলেছে। তারই ফাঁকে কারো কারো মাথাধানা ঘাড়ের ওপর ব্যালেন্স হারিয়ে এদিক ওদিক দুলছে—মাথার মালিক ঘুমিয়ে পড়েছেন।

* * *

বিহার ছেড়ে বাংলা দেশে ঢুকে এসে ভাবা গেল—আর তো মেরে আনা গেছে। বিষ্যুদবারটি বোধ হয় আর এই দলটির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না।—আধ ঘণ্টাও কাটলো না, আমরা বাঁকুড়ায় সবে ঢুকেছি দুম ফটাস! টায়ার ফাটলো! যাঃ, একেবারে পথে বসাল। দুপাশে ধানক্ষেত, সূর্য ডুবছে। সুন্দর লাগছে দেখতে, কিন্তু আমরা বেয়াল্লিশটি প্রাণী, মায় ড্রাইভার ক্লীনার সবাই যে একসঙ্গে খোঁড়া হয়ে গেলাম! আজ তো চার তারিখ—আজ যে কলকাতা পৌঁছতেই হবে! গেরোটি এবার বেশ মোক্ষম করেই পড়ল যে!·····

ড্রাইভার ক্লীনারের সঙ্গে ছেলেরা লেগে গেল—নতুন টায়ার পরিয়ে গাড়ি চালু করল। ভাবছি আর কি নতুন গেরো হতে পারে, সব রকম তো হল। এখন মধ্য রাত্রি। শেষ রাত্রেও কলকাতা পৌঁছতে পারি কি না পারি! বললে বিশ্বাস করবেন না মশায়—শেষ পর্যন্ত ডাকাতের পাল্লায়ও পড়তে হলো! নাঃ, একটু বাড়িয়ে বললাম—আসলে পড়তে হতো! এর মধ্যে গাড়ি থামিয়ে একটু আগেই কালীপূজোর চাঁদা চাওয়াও হয়ে গেছে, অবশ্য ভদ্রভাবেই।···আবার হাত দেখিয়ে কে বা কারা যেন আমাদের রথ থামালো। সারথীর সঙ্গে কথা হচ্ছে—রাত তখন বোধ হয় আড়াইটে। উঁকি মেরে দেখি লাল টুপি পরা দুটি পুলিস একটা লরী থেকে নেমেছে। পাশে একটি রিক্‌শা দাঁড়িয়ে। রিক্‌শা-চালকের দিশেহারা ভাব।

পুলিসরা আমাদের সাবধান করে দিয়ে, যা বললে তার মর্ম এই—লরীটা করে কিছু মালপত্র কলকাতায় যাচ্ছিল। এখানটায় প্রায়ই আজকাল ছিনতাই হয় বলে আজ দুজন পুলিস—অর্থাৎ তারা নিজেরাই লরীর ভেতর ছিল। এই রিকশা করে দুজন গুণ্ডা দুটো রিভলবার নিয়ে গাড়ি আক্রমণ ও লুঠ করতে আসছিল। লরীর ভেতর পুলিস দেখেই তারা নাকি রিকশাতেই রিভলবার টিভলবার ফেলে টেনে দৌড়!..... বিপ্লব, সফিকুল বললে—তারা নাকি ঘাড় উঁচু করে রিকশার সীটে দুটো কি চকচক করছিল দেখেছে!!.....আমরা দুরু দুরু বক্ষে এগিয়ে চললাম। সকলের চুলুনি ছুটে গেল। দূর থেকে কোন লোক দেখলেই মনে হচ্ছে—এই বোধহয় সেই পালানো ডাকাত দুটো!!

এত কাণ্ড করেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিষ্যুদবারের গেরোর ফাঁস আমাদের গলায় বসেনি। তার হার হলো, কারণ আমরা বহাল তবিয়তে পাঁচ তারিখ ভোর পাঁচটায় আমাদের সাধের কলকাতায় ফিরে এলাম।

জয় অধুজিকী জয়! জয় ব্রতচারীর জয়!!

---

১০১ পৃষ্ঠার 'করতে পার' ছবির উত্তর

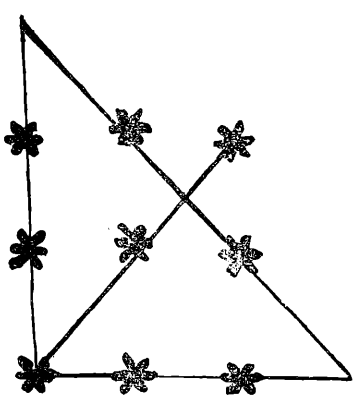

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

আজকেই বেলা দশটার মধ্যেই আমাদের যাত্রা করতে হবে, তাই আমাদের সঙ্গীদের মধ্যেও যত তাড়া, রণমলভাই-এর পক্ষেও তেমনি তাড়া। রণমলভাই আমাদের যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। আমরা এখান থেকে নৌকাযোগেই যাচ্ছি ফোর্ট পোরট্যালে···ওখান থেকে ইউগাণ্ডার দিকে রওনা দেবো···আমাদের সাফারির লরী আর পিক্‌আপ্ অপেক্ষায় আছে।

সেমলিকি নদীর ওপর পরপর চারখানা বোট সাজানো, Ready···তিনখানি নৌকা আমাদের জন্যে, আর একখানি রণমলভাইয়ের নিজের জন্যে। এ যেন এক নৌকার কনভয়।

যাত্রার অনতিপূর্বে রণমলভাই আমায় তাঁর ক্যাম্পে নিয়ালায় ডেকে নিয়ে আমার হাতে কয়েকখণ্ড পাথর ধরিয়ে দিলেন।

আমি বলি—এগুলো কি···এ যে পাথর!

উনি বলেন—এটা তো চিনতে পেরেছেন?

আমি দেখি লালমত একটা পাথর···তার ভেতর রয়েছে এক ঔজ্জ্বল্য চাপা···

আমি বললাম—এটা লাল কোয়াড্‌জ পাথর?

উনি বলেন—কোয়াডজের মতই কাঁচা পাথর মাত্রেই দেখায়। এটা পদ্মরাগমণির পাথর। পাথর-কাটিয়েদের কাছ থেকে কাটিয়ে নেবেন তারপর বুঝবেন এর কদর।

আমি বলি—পদ্মরাগ পাথর মানে চুনি তো?

উনি বলেন—মা···চুনীর ঔজ্জ্বল্য বেদানার দানার মত, কিন্তু পদ্মরাগ পাথর কাটাবার

পর দেখবেন ওপর থেকে এর ঔজ্জ্বল্য বাদামী হলদে বলে মনে হবে। কিন্তু এর মধ্যে একটি লাল স্পট্ পাবেন, যা এর বাদামী হলদে চেহারা বদলে লালাভ করে তোলে।

রাত্রে এ পাথর দেখাবে লাল আর দিনের বেলায় বাদামী লালের অংশের মাঝে রক্তাভ আভা!

আমি বলি—এ পাথরগুলোও কি তবে সব দামী দামী পাথর?

উনি বলেন—এখানা স্বর্ণ-পাথর (Gold ore)···বাইরে থেকে একে দেখলে মনে হয় একখানা সামান্য পাহাড়ে পাথর, কিন্তু যদি পরিষ্কার জলের মধ্যে একে ছেড়ে দেওয়া যায়, দেখবেন এর গাভর্তি সোনার কুচি চিকচিক করছে···এই সব পাথর crust করে ···process করে সোনা বার করা হয়।

এটা পদ্মরাগমণির পাথর। [পৃষ্ঠা ১২৬

এবার এ পাথরটা দেখুন কত ছোট্ট, কিন্তু ওজনে কত ভারী বলে মনে হবে। এ পাথরখানা কিসের জানেন, 'প্ল্যাটিনাম ওর'। এ থেকেই প্ল্যাটিনাম বার করা হয়। জগতে এ ধাতুর চেয়ে দামী ধাতু আর নেই।

আর একখানা মাঝারি পলতোলা পাথর আমার হাতে দিয়ে বলেন—এটা কিন্তু দামী নয়, তবে খুব ভারী পাথর। এটা হচ্ছে "টিন-ওর"। শুধু specimen হিসাবে দিলাম।

আমি ওঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিই।

উনি আমার হাতে আরও দুটো জিনিস বার করে দিলেন—একটি হচ্ছে হাতীর দাঁতের একছড়া মালা···আর দুটো সিংহের নখ। আমায় বললেন—সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিলে সুন্দর দেখাবে···আর নখ দুটোতে দুটো লকেট হবে। আপনার স্ত্রীকে আমার নাম করে দেবেন।

আমি হাসি···বলি—স্ত্রীই নেই তো···

উনি কথা কেটে হেসে বলেন—বেশ তো এখন নেই—যখন হবে তখন দেবেন···আর বলবেন এগুলো কঙ্গো বনের এক জংলী মেয়ে নীলাঞ্জী সংগ্রহ করেছিল পিগ্‌মীদের গেঁজে থেকে···যে মেয়ে আমার মনে দাগ কেটেছে।

হো হো করে রণমলভাই হাসতে থাকেন।

আমি বলি—যাঃ বেশ বলেছেন। তবে যত ঠাট্টাই করুন নীলাঞ্জীর তৎপরতা কর্মকুশলতা আর বুদ্ধিচালনা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। তার নাচও আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উনি বলেন—নীলাঞ্জীকে আমি আশ্রয় দিয়ে তৈরি করেছিলাম আমার নিজেরই স্বার্থে সে কথাটা ঠিক। কিন্তু আজ আমার অবস্থাও অনেকটা আপনারই মত মিঃ বোস। বোধ হয় ওকে আর কাউকে দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো না।

বুশমেন সর্দার ঘরে এসে ঢুকে রণমলভাইয়ের জিনিসগুলি নৌকায় তুলে দেবার জন্যে মাথায় উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রণমলজী বলেন—এই বুশমেন সর্দারও হচ্ছে আমার আরও একটি সংকলন। আমৃত্যু হয়ত আমার সেবা করে চলবে···কিন্তু কি বা মূল্য আমি ওর দিই।···ভেবেছিলাম নীলাঞ্জীর সঙ্গে ওর সাদী করিয়ে দিয়ে এইখানেই ওদের বসতি তৈরি করে দেবো···

অজান্তে আমার বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে রণমলভাইও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

রণমলভাই বললেন—জংলী জীবনে দয়ামায়া মমতাগুলো অবান্তর পর্যায়েই পড়ে থাকে মিঃ বোস···তবু আমাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজন পরিবারবর্গের কথা মনে করলে এদের দেখেও মাঝে মাঝে মায়া আসে।

* * *

সবাই Ready···

সবাই একে একে নৌকায় পদার্পণ করি।

রণমলভাই বলেন—অল্ ও-কে···স্টার্ট···তারপর আমার দিকে চেয়ে হো—হো করে হেসে ওঠেন।

—আজ আমি ডাইরেকশান দিয়ে নিয়ে চলবো। এ আর আপনার ছবির স্যুটিং নয় মিঃ বোস। এ হচ্ছে আমার একচুয়াল এড্‌ভেনচারাস্ জার্নী!

নৌকা একসঙ্গে ছেড়ে দিল।

আবার সেই বন্য মাঝিদের হুইল্লালা আওয়াজ সুরে সুরে সেমলিকির দুই তীর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

দূরে সরে যাচ্ছে রৈঞ্জুরু ক্যাম্প।

মনে হচ্ছে···এখনি রৈঞ্জুরুর কথা আমার অতীত অধ্যায়ের এক চমকপ্রদ কাহিনীতে

রূপান্তরিত হবে। ঐ দূরের মোহনা···লক্ষ কুমীরের জলক্রীড়াভূমি ডান পাশে পড়ে রইলো সেও এক আরব্য উপন্যাসের গল্প পর্যায়ে পর্যবসিত হোলো।

তবু চলেছি বাস্তব প্রকৃতির অঢেল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে। সেমলিকি নদীর অপর পারে পাহাড়ের পর পাহাড় ছুটে চলেছে···এ পারে রিয়াঞ্জারো রেঞ্জের দৌড়।

ওপারের পাহাড়গুলোর পাথরে সূর্যকিরণ পড়ে যেন হীরের মত জ্বলজ্বল করে উঠছে।

রণমলভাই আঙুল দেখিয়ে বলেন—ঐসব পাহাড় এখান থেকে বহুদূর নয়। ওগুলো লেক এলবার্টের পশ্চিম উপকূলে। ওইগুলিই হচ্ছে আসল সোনার পাহাড়·· Mount of the Gold। এর খাদে খাদে অফুরন্ত সোনা···যা সারা পৃথিবীর লোক তুলে শেষ করতে পারবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করি—এসব কার সম্পত্তি?

রণমলভাই হেসে বলেন—"খুঁজি খুঁজি নারী—যে পায় তারই।"

বেলজিয়ান কঙ্গোর সম্পত্তি আপাততঃ বেলজিয়ামের। তবে পূর্বের নিউগিনির গোল্ডকোস্ট লাইন পর্তুগীজদের প্রথম সভ্যজগতে আবিষ্কারক তাই আজও তারা তার মালিক।

আমি এখন সামান্য হলেও রৈঞ্জরুর মালিক হয়ে বসে আছি···আসলে আমরা সবাই লুটেরা···সবাই ডাকাত। সম্পত্তি হচ্ছে বুনোদের···জংলীদের···ঐ আদমখোরদের। তারা তাদের দেশকে চেনে না··জানে না। তাই বিদেশীয় দস্যুর দল তাদের হাতে কাঁচ তুলে দিয়ে হীরে কেড়ে নিচ্ছে।

প্রকৃতির সন্তানদের প্রকৃতিস্বভাবকে ভেঙেচুরে সভ্য বানাবার চেষ্টা করছে নিজেদের প্রয়োজনে। কিন্তু আমি জানি মিঃ বোস, যেদিন ওরা আমাদের মত চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে, বেধে যাবে রাম-রাবণে লড়াই···

সোনার লঙ্কার অধিকারী রাক্ষসরাই থাকবে।

তবে অসভ্য রাক্ষসদের নয়···আমাদের শেখানো শিক্ষাদীক্ষায় এক সভ্য রাক্ষসদের হাতে।

আজ আমরা যেমন ওদের রাক্ষস নরখাদক আদমখোর আখ্যা দিয়ে ওদের সম্পত্তি নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছি, ওরাও সেদিন আমাদের রাক্ষস দস্যু তস্কর বলে তাড়া করে আমাদের এদেশ থেকে দূর করে দেবে।

রণমলভাইয়ের কথাগুলোর সত্যতা হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে চুপ করে থাকি।

নৌকার মাঝিদের একঘেয়ে গানে যেন মায়া আছে···কঙ্গোর ভীষণ জঙ্গল পরিবেশেও তা যেন মনে ছন্দ কাটতে থাকে।

মিঃ ব্যানার্জী বলেন—কি মিঃ বোস আজ এমন চুপচাপ কেন, অ্যাডভেঞ্চার এখনও শেষ হয়নি···পুবের আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন !

পুব আকাশের কোলে কালো মেঘ জমে উঠেছে···ক্ষণে ক্ষণে তাতে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে···

আমি বলি—এ কি ? বৃষ্টি হবে নাকি ?

রণমলভাই বলেন—ভয় নেই···বৃষ্টির এখনও এক সপ্তাহ দেরি আছে। এ অঞ্চলে··· বিশেষ করে বিষুবরেখার ওপর বৃষ্টি হবার সাত আটদিন আগে থেকেই এই বিজলীর খেলা আকাশের গায়ে গায়ে দেখা যায়···এই নিশানায় বুঝি যে বর্ষার সময় কাছে এসে পড়েছে।

আমি বলি—শুনেছি যে এখানে একবার বর্ষা নামলে আর থামতে চায় না। সাম্বা বনস্থলীর রূপ এমন ভয়ংকর হয়, যে পথঘাট সব বন্ধ হয়ে যায় ! তাই তো আমরা এত তাড়াতাড়ি করে সব জায়গাই স্যুটিং সেরে নিতে ছুটোছুটি করে মরছি !

রণমলভাই বলেন—হ্যাঁ এখানে বছরে দুবার করে বর্ষা আর দুবার করে শীত পড়ে। অন্য ঋতু এ দেশে নেই। এবারের বর্ষা বড় বর্ষা। বর্ষার সময় এ সব নদী ধরে ভীষণাকার। দুপাশের পাহাড় থেকে অবিরল ধারায় দুরন্ত স্রোত নেমে আসে। জঙ্গলের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত জল জমে। এখানকার ব্ল্যাককটন সয়েলে জল পড়ে তা হয়ে ওঠে এক চটচটে আঠা···কার সাধ্য পা ফেলে পা তুলতে পারে। গাড়ির চাকাগুলোকে যেন আঠার মত আটকে ধরে। এই সব বিপদ। তাই ও সময়টা কাজ করা যায় না, তাইতো আমরা পিঁপড়েদের মত রোদেই খাবার সংগ্রহ করে রাখি !

আমি বলি—আমাদের ফোর্ট পোরট্যাল পৌঁছাবার মধ্যে বৃষ্টি নামবে না তো ?

মাখন সিং এবার কথা বলেন—কঙ্গোতে বৃষ্টি নামবার প্রায় চার পাঁচদিন পরে বৃষ্টি নামে ইউগাণ্ডায়। কেনিয়াতে তারও চার পাঁচদিন পরে বৃষ্টি পাওয়া যায়। কাজেই আপনারা স্টীমারে ওঠার পরই ধরুন বৃষ্টি নামবে।

* * *

ফোর্ট পোরট্যালে এসে যথাসময়েই পৌঁছে গেলাম। পথের দুর্যোগ পথের ধারেই ছেড়ে এসেছি। পৌঁছে গেছি সর্দারজীর বারান্দার কুঠিতে।

সর্দারজীর বিদায় সম্ভাষণ শেষ করে যেদিন মোটরে উঠে বসলাম সেদিনই প্রথম দেখলাম···সর্দারজীর দুচোখ ভরা জল।

হাঁ করে চেয়ে থাকি···ভাবি দস্যু রত্নাকরের চোখেও জল···যে মিষাদ পশুপক্ষী মেরে জীবনের পরমানন্দের সন্ধান পেয়েছে·· সে কি করে এই সামান্য সৌহার্দ্য বেদনায়

আকুল হয়ে ওঠেন। ভারী অদ্ভুত ভগবানের সৃষ্টি···একই মনের মধ্যে এই কোমল-কঠিনের সমন্বয়···এ কি করে সম্ভব হয়?

আমার চোখের পাতাও ভিজে উঠেছে। বললুম—আজ থেকে আমাদের এই একস-পিডিশন হয়ে থাক আমাদের দুটো জীবনের এক স্মৃতির ভাণ্ডার। যদিও জানি আপনার স্মৃতি বিরাট ভাণ্ডারের এক কোণেই স্থান হবে। তবে হয়ত কোনো এক অবসরক্ষণে আপনার মনে জাগবে আমাদের সেই ভয়কাতর মুখগুলি আর তাদের ভয়ার্ত আর্তস্বর।

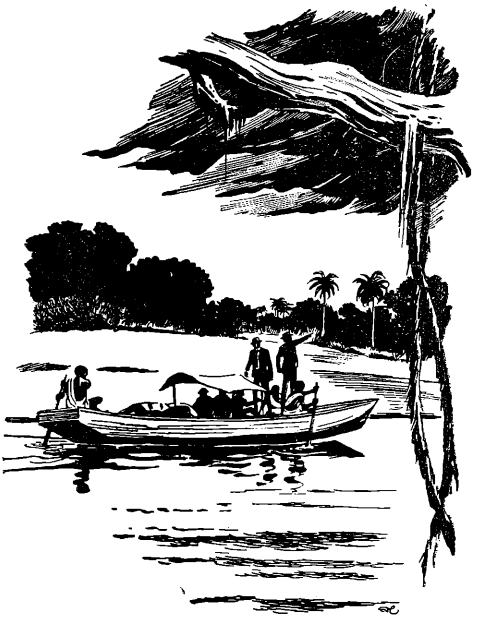

পুর্বের আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন।
[পৃষ্ঠা ১৩০

* * *

ফিরে এসেছি ভারতবর্ষে—।

ফিরে এসেছি কলকাতায় নিজের আবাসে।

সেইখান থেকে আফ্রিকার সব জায়গাতেই একখানা করে চিঠি দিলাম।

তিনখানি চিঠিতে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। তার মধ্যে রণমলজী ভাইকে লিখেছিলাম নীলাঞ্জীর কথা।

উত্তরে রণমলভাই লিখেছিলেন যে চিঠিটা সেটা তুলে দিচ্ছি।

"রঞ্জরু"···কঙ্গো।

শ্রদ্ধাপদেষু বোস সাহেব,

আপনার প্রাণের আবেগপূর্ণ ধন্যবাদ চিঠি পেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি। আফ্রিকায় জঙ্গলে যাঁরা আসেন···তাঁরা ফিরে গিয়ে কখনই আমাদের মনে রাখেন না···তা কি ইংরেজ··· ভারতীয়···আরবী বা আমেরিকান।

বহু হাণ্টার আমার ক্যাম্পে থেকে গিয়েছেন কিন্তু কখনও কারও কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আপনার চিঠির আশাও আমি করিনি। কাজেই আপনার চিঠি পেয়ে এতই আনন্দ পেয়েছি তা চিঠিতে লিখে জানানো যায় না। তার উপর আপনার আন্তরিক মনের অভিব্যক্তি আমায় সত্যিই অভিভূত করেছে।

এ ছাড়া সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি···যে আপনি এখানকার ছোট ছোট ঘটনারও উল্লেখ

করতে ভোলেন নি···অর্থাৎ আমার দেওয়া ওই সামান্য উপহারের কথাই বলতে চেয়েছি··· কিবা দিয়েছি···আর তা আপনার কতটুকুই উপকারে লেগেছে।

আমার পদ্মরাগ পাথর কাটিয়ে নিজের হাতের আঙটিতে বসিয়ে আমাকে প্রতিনিয়ত স্মরণে রাখবার চেষ্টা করছেন জেনে অভিভূত হয়ে পড়েছি।

আপনি দেখছি এখানকার লোকজনদের কথা পর্যন্ত ভুলে যাননি···বুশমেন সর্দারকে আপনার চিঠি পড়িয়ে শুনিয়েছি। সে তো মহা খুশী।

এমন ব্যাপার যে এ জগতে ঘটে···কেউ কারও জন্য এতদূর থেকে চিঠি লেখে···এটাই তার কাছে পরম আশ্চর্য।

এখানকার সব ভালভাবেই চলেছে···তবে আপনাদের যাবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা নেমেছে। আপনারা লাকি···নইলে এবার বর্ষা দুদিন আগেই নেমেছে।

সর্ব পরিশেষে জানাই যে···

আপনার নীলাঞ্জী আবার ক্যাম্পে ফিরে এসেছে।

—সমাপ্ত—

কলিকাতার বাগবাজার হইতে শ্রীচণ্ডীদাস পাল তাঁর স্বর্গগত পুত্র শান্তনুকুমার পালের পুণ্য-স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺শান্তনুকুমার পাল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

হিংসার ফল

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩১শে বৈশাখ ১৩৮০। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী শ্রাবণ ১৩৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার ১০·০০ টাকা

জন্ম : ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯
মৃত্যু : ৬ই ভাদ্র ১৩৭৯

দ্বিতীয় পুরস্কার ৫·০০ টাকা

উৎকলাকেশরী কপিলেন্দ্র

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

"নীল সিন্ধু জল ধৌত চরণতল"—

চরণ চুম্বন করে বঙ্গসাগরের নীল জল যখন লহরে লহরে নেমে যায় শুভ্র সৈকতের বুকের উপর দিয়ে, তখন তার সঙ্গে মিশে সবার অলক্ষ্যে অনন্তের পথে ভেসে যায় উৎকল-মাতার অশ্রুধারাও।

কাঁপছে উৎকলভূমি, আজ তার বড় দুর্দিন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। বৃদ্ধ হিরণ্যবর্মার আর শক্তি নেই রাজদণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার। তিনি শুধু সভাসদ সচিবদের নিয়ে অতীত গৌরবের গালগল্পে মশগুল হয়ে থাকেন। রাজকাটের ভাগ্যে যা ঘটবার তা ঘটে।

অতীত গৌরব? তা ছিল বই কি! বাহাত্তর বৎসর একটানা রাজত্ব করেছিলেন অনন্তবর্মণ। পৃথিবীর ইতিহাসেই যা অতুলনীয় ব্যাপার একটা। গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। দারুব্রহ্মকে অভ্রংলেহী মহামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের জন্মও সেই সূত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। সংস্কৃত আর তেলেগু দুটো ভাষায় সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী, ধর্মনিষ্ঠ নরপতি।

তারপর নরসিংহ দেব। মুসলিম আক্রমণের ঢেউ এল বঙ্গদেশ থেকে, তিনি তা বাহুবলে প্রতিহত করলেন। কোণারকে প্রতিষ্ঠা করলেন সূর্যমন্দির, আজও যার পানে তাকিয়ে পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। ছিল! ছিল! প্রভূত গৌরবই ছিল উৎকলের সেকালে।

সেকাল অবশ্য প্রাচীন কাল নয়, মাত্র দুই এক শতাব্দীর আগের ব্যাপার। এই দুই শতাব্দীর ভিতরেই ঘোরতর অধঃপতন হয়েছে উৎকলের। ক্ষীণায়মান রাজশক্তি এবার বুঝি পরিপূর্ণ বিলুপ্তির মুখে। হিরণ্যবর্মা কোনদিনই খুব সক্ষম শাসন ছিলেন না। এখন এই ষাট বৎসর বয়সে তাঁর কাছ থেকে দেশের মানুষের আর আশা করবারও কিছু নেই, আশঙ্কা করবারও না।

হিরণ্যবর্মা আছেন, সিংহাসনে বসেন রোজ অন্ততঃ প্রহর কালের জন্য। মন্ত্রী আসেন, মন্ত্রণা কিছু হয় না। সেনাপতি আসেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনা যায় না। সভাসদেরা আসেন, আর তাঁরা এসেই চোড়গঙ্গা রাজবংশের হারানো গরিমার নতুন নতুন কাহিনী আওড়ায় রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য।

চলছিল একরকম মসৃণভাবেই। মাঝখান থেকে গোল বাধাল একটা দস্যু। ঘৃণ্য, অন্ত্যজ, অভিশপ্ত একটা ডাকাত। নাম তার কেউ মুখে আনে না, যদিও ভালই জানে সবাই যে তার নামটা হচ্ছে চণ্ড। কদাচিৎ কেউ ভুল করে হয়ত 'চণ্ডে ডাকাত' সম্বন্ধে কোন উগ্র মন্তব্য করতে উদ্যত হন, আর অমনি দুইধার থেকে বন্ধুরা তাঁকে তর্জন করে ওঠেন—"নাম না করে কি কথা কওয়া যায় না? ঐ নরকের জীবটার নাম নিলেও নরকস্থ হতে হবে।"

তা নারকী জীব অবশ্যই ঐ চণ্ড। জাত্যংশে কী যে সে, তা কারও জানবার উপায় নাই। কারণ লোকলোচনের সমুখে অশিব ধূমকেতুর মত সহসা যখন উদয় হল তার, তখন তার অতীত নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা মনেও হয়নি কারও। তার বর্তমান কার্যকলাপই ভগ্নাবশেষ প্রশাসন এবং হতাশাজর্জরিত নাগরিক সমাজের যথেষ্ট ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কার্যকলাপ? তা ময়ূরের কলাপের মতই চণ্ডের কুকীর্তি-সমুদয় জমকালো হয়ে আছে তার নামকে ঘিরে। চুরি? আগে হয়ত করতো, এখন আর দরকার হয় না তার। ডাকাতি? ছোটখাটো আয়তনে ডাকাতিও করে না সে, ওসব তার আশ্রিত ছোট ছোট সমাজবিরোধী-দের মাঝে বেঁটে দিয়েছে দাক্ষিণ্যের প্রেরণায়। তারাও করে খেতে চায় তো!

তবে বড় বড় ডাকাতি এখনও সে করে! বড় বড় জায়গাতেই করে। একটা গোটা শহরের উপরে একই রাতে আক্রমণ চালায় পাঁচ সাত দশ হাজার দস্যু নিয়ে। নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা আসে। কবে আসবে, অন্ততঃ একটা দিন আগে তা জানিয়ে দিতে ভুল হয় না চণ্ডের। এই রকম একটা দাবি আসে পত্রযোগে—"বিশ লক্ষ মোহর কাল পাঠিয়ে দেবে অমুক জায়গায়" বা ঐ রকম অন্য কিছু। বলা বাহুল্য সে দাবি পূরণ করার সাধ্য হয় না উদ্দিষ্ট হতভাগ্যদের। তারা হাতের মাথায় যা পায়, তাই হাতে নিয়ে পালিয়ে যায় দূরে দূরান্তরে। যথাসময়ে চণ্ড এসে লুঠ করে বাড়িটা বা শহরটা। নগদ অর্থ পায় না, তাতে কী?

সেনাপতি ভদ্রসেন মাথা চুলকে বলেন— [পৃষ্ঠা ১৩৬

তৈজসপত্র। মূল্যবান আসবাব, গৃহদেবতার মূর্তি, এমন কি দরজা জানালা পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায় তার লোকেরা। বেশীদূর নিতেও হয় না। ও-সবের খরিদ্দার ঠিক হয়েই আছে তার। তারা সঙ্গে সঙ্গেই নগদ মূল্য দিয়ে দেয় চণ্ডকে।

হাঁ, অতর্কিত আক্রমণও করে বই কি চণ্ড! করে সরকারী কোষাগারে। খাজনা আদায়ের মরসুমে। সশস্ত্র প্রহরী থাকে তখন ওসব জায়গায়, আচম্বিতে হানা দিয়ে তাদের পাঠায় যমালয়ে, মজুদ অর্থ নিয়ে নাচতে নাচতে চণ্ড চলে যায় নিজ স্থানে।

তবু চলছিল এক রকম। মসৃণভাবে না চলুক, রাজগীর ঠাট কোন রকমে বজায় ছিল এতদিন। কিন্তু আর বুঝি থাকে না।

থাকে না, কারণ দস্যুটার দম্ভ আকাশ স্পর্শ করেছে। এতদিন সে ছোটখাটো শহরে বন্দরে অভিযান চালিয়েই তৃপ্ত ছিল, এইবার সে হাত তুলেছে পুরী রাজধানীর দিকে। চিঠি পাঠিয়েছে খোদ নগরপাল বিষ্ণুরামের নামে। চিঠিতে আছে সেই মামুলী বয়ান, একদিনের সময় দিয়ে বলা হয়েছে—তিন লক্ষ মোহর খণ্ডগিরির পাদদেশে মস্তরাম বাবাজির আশ্রমে পৌঁছে দেওয়া চাই, তা নইলে রাজধানী লুণ্ঠন করে যথাসর্বস্ব নিয়ে যাবে চণ্ড, রাজপ্রাসাদও বাদ যাবে না।

বজ্রপাত! রাজার মাথায়, মন্ত্রীর মাথায়, সেনাপতি নগরকোটাল, সভাসদ পারিষদ সবার মাথায় বজ্রপাত হল আচম্বিতে। রাজধানীতে বসে থেকেও রেহাই নেই? কত দস্যু

আছে চণ্ডের দলে যে সে সাহস পায় এমন স্পর্ধা প্রকাশ করতে ? দশ হাজার ? বিশ হাজার ? লক্ষ ? লক্ষ দস্যু দলে থাকলেও তো রাজধানীতে হামলা করা চলে না ! রাজসৈন্য বলে একটা জিনিস তো দেশে রয়েছে এখনও। যুদ্ধ অবশ্য তারা করে না আর, কিন্তু তরোয়াল-টরোয়াল আছে তো নিশ্চয়ই ! "কী বলেন সেনাপতি মশাই ? নেই তা ?" প্রশ্ন করল জনৈক কৌতূহলী।

সেনাপতি ভদ্রসেন মাথা চুলকে বলেন—"থাকার তো কথা ! আছে নিশ্চয়ই ! খোঁজ নিই তাহলে ! অর্থাৎ চণ্ড দস্যুর দাবিটা অগ্রাহ্য করাই যদি মহারাজের ইচ্ছা হয় !"

না, না, অমন ইচ্ছা মহারাজ কখনোই করবেন না। যুদ্ধবিগ্রহ পাপকর্ম। তাও কোন রাজারাজড়ার সঙ্গে যুদ্ধ হলেও বা কথা ছিল। একটা অন্ত্যজ ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধে নামা যে কেলেঙ্কারির ব্যাপার ! না, পাঠিয়ে দাও ওকে তিন লক্ষ মোহর। নেই ? হ্যাঁ মন্ত্রিমশাই ? রাজকোষে তিনলক্ষ মোহর নেই ? নিতান্তই না থাকে যদি, শ্রেষ্ঠীরা আছে। ধার নাও। খাজনার মরসুমে শোধ করে দিও সুদ সমেত। শ্রেষ্ঠীরা দেবে না ? শুধু হাতে না দেয়, মন্দিরে মন্দিরে দেবতাদের রত্নালংকার আছে। সেগুলি চেয়ে এনে বাঁধা রাখো শ্রেষ্ঠীদের গদিতে ! মোটে তিন লক্ষ মোহরের ব্যাপার তো ! অনায়াসে সংগ্রহ হবে। অনায়াসে না হোক, সামান্য কিছু আয়াস করলেই হয়ে যাবে। মন্ত্রিমশাই সেই চেষ্টাই করুন নগরকোটাল বিষ্ণুস্বামকে নিয়ে।

সেনাপতি ভদ্রসেন বিরস মুখে মন্তব্য রাখলেন—"ঐ সঙ্গে যদি তরোয়ালগুলোর মরচে সাফ করার একটা ব্যবস্থা হয়, তাতে দোষ কী ?"

ততোধিক বিরসমুখে রাজা হিরণ্যবর্মা বললেন—"দোষ এই যে তার দরুন আবার অকারণ খরচা কিছু হবে। কালই আপনি এসে বলবেন যে মরচে-সাফাইয়ের জন্য ক্ষার কিনতে হয়েছে হাজার মোহরের, দিন সেটা। না, না, মশাই, চণ্ডের উৎপাত সইতে হবেই, না সইলে চলবে না। কিন্তু মরচে-সাফাইয়ের উৎপাত আর তার উপরে চাপাবেন না, ওটা হবে অকারণ খরচা।"

হঠাৎ মহারাজের চোখ-মুখে গভীর বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠল—"মন্ত্রি ! ইনি কে ?" —প্রশ্নটা তাঁর অজান্তেই বোধ হয় মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

মন্ত্রী জানেন না—ইনি কে। সুতরাং আগন্তুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশ্ন করলেন—"আপনি কে মহাশয় ? বিনা অনুমতিতে রাজসভায় প্রবেশ করা উচিত হয় নি আপনার। আর নগররক্ষক মশাই, আপনারই বা এ ব্যাপারে বলবার কী আছে, বলুন তো ! আজকাল কি এই রকম ব্যবস্থাই চলছে রাজধানীতে যে যে-কেউ যখন খুশী তখন রাজসভায় এসে ঢুকে পড়তে পারে ? তার জন্য কোন অনুমতির আবশ্যক হয় না ?"

নগরপাল কী কৈফিয়ৎ দিতেন, তিনিই জানেন। কিন্তু দিতে তাঁকে হল না কোন কৈফিয়ৎ। সুদর্শন আগন্তুকটি নিজেই দিলেন নিজের পরিচয়—

কোণারকে সূর্যমন্দির আছে, অমিতকীর্তি নরসিংহদেবের প্রতিষ্ঠিত। সেই সূর্যমন্দিরে আছেন বংশানুক্রমিক পূজারী। মূলে তাঁরা কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ, এখনও যোগাযোগ রেখেছেন কনৌজের সগোত্রদের সঙ্গে। সেইরকমই এক কনৌজবাসী সগোত্রের প্রতিবেশী আমি, ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়। দেশভ্রমণে বেরুবার আগে এখানকার পূজারী মহাশয়ের নামে একখানা পরিচয়-পত্র নিয়েছিলাম, সেই সগোত্র ঠাকুরের কাছ থেকে। তারই সূত্রে কোণারকে এসে উঠেছি। নাম আমার কপিল। কপিলেন্দ্র সিংহই আসলে, নিজেই ওটা সংক্ষেপ করে নিয়েছি।"

রাজকার্য ছাড়া আর সবেতেই দুর্বার কৌতূহল রাজার এবং রাজসভাসদবর্গের। বিশেষ চণ্ডের ব্যাপারের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা যখন হয়ে গিয়েছে ইতিপূর্বেই। এখন, সুতরাং, এই কনৌজিয়া পর্যটককে নিয়ে খানিকটা বৈঠকী আলাপ অনায়াসেই করা যেতে পারে। সোৎসাহে সভাজন সবাই নিজ নিজ আসনে নড়ে চড়ে বসলেন।

তবে বৈঠকে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ার আগে মন্ত্রী একবার নগরপালকে বললেন—"আপনি তা হলে যান। মন্দিরে মন্দিরে অলংকার সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন। শুধু হাতে শ্রেষ্ঠীরা ধার দেবে না আমাদের।"

নগরপাল বেরিয়ে গেলেন রাজাকে প্রণাম জানিয়ে। মুখ তাঁর ব্যাজার, কপালে তাঁর ভ্রূকুটি। মন্দির থেকে গহনা আদায় করা সোজা কাজ নয়। সেবাইতেরা সব ধুরন্ধর লোক, বিষয়-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠীদের চাইতে কম যায় না তারা। শুধু হাতে গয়না রাজার হাতে তুলে দেওয়া, তারাই বা এমন বোকামি করবে কেন? অনেক দুর্ভোগ আছে আজ নগরপালের বরাতে।

যাক সে-কথা। নগরপাল গেল, কপিলেন্দ্র আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। একটা আসন তাঁকে দেওয়া হয়েছে রাজার সমুখে, অনতিদূরেই। তিনি কিন্তু সে-আসন গ্রহণ করেন নি—"মহারাজ যদি অনুমতি করেন, আমি দাঁড়িয়েই থাকব। দাঁড়িয়ে কথা বলতেই ভাল লাগে আমার। হ্যাঁ, পরিচয়? ঐ তো বললাম, নাম কপিলেন্দ্র সিং ওরফে কপিল। ক্ষত্রিয় বর্ণ, যুদ্ধব্যবসায়ী পুরুষানুক্রমে। চেহারা দেখেই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে লড়াইটড়াই করা অভ্যাস আছে আমার। এই যে কপালের কাটা দাগ, এটা বিন্ধ্যাচল যুদ্ধের স্মৃতি-চিহ্ন। আর এই বাহুতে, এই বুকে—"

জামা খুলে খুলে কপিলেন্দ্র দেখালেন—কাঞ্চনবর্ণদেহের প্রতি অঙ্গে একটা করে গভীর ক্ষতচিহ্ন। কে একজন সভাসদ বলে উঠলেন—"ওঃ, আজও পৃথিবীতে এত যুদ্ধ হচ্ছে? ভগবান বুদ্ধদেব অহিংসার বাণী প্রচার করবার পরেও?"

"অহিংসার বাণী প্রচারের ফলে হিংসা বরং বেড়ে গিয়েছে পৃথিবীতে। কারণ নিরীহের উপরে অত্যাচার চালাবার জন্য স্বভাবতঃই একটা ঝোঁক আছে মানুষের। অনেক ভারতবাসী যে অহিংসাবাদী হয়ে নখদন্ত বর্জন করেছে, তাতে তো আর সন্দেহ নেই! ফলে তাদের উপরে হিংসাবাদীদের হামলা প্রবল হয়েছে আরও।"—এ মন্তব্য আগন্তুক কপিলের।

নখদন্তবর্জন? মন্ত্রীর যেন মনে হল—কথাটা এই রাজসভার সম্বন্ধেই একটা অশিষ্ট কটাক্ষ, একটু কটুকণ্ঠেই তিনি বলে উঠলেন—"আপনি যখন অত বড় যুদ্ধ করেছেন, তখন আমাদের এই ডাকাতটাকে শায়েস্তা করে দিন না!"

"চণ্ড?"—কপিলেন্দ্র স্মিত হাস্যে বললেন—"রাজধানীতে এসে শুনেছি তার কথা। না-শুনে উপায় কী? শহরের লোকের মুখে অন্য কথা তো আর নেই আজ! কিন্তু চণ্ডকে শায়েস্তা করতে আমাকে লাগবে কেন আপনাদের? উৎকলে কি সৈন্যসামন্ত নেই?"

রাজা হাত নেড়ে আশ্বস্ত করলেন কপিলেন্দ্রকে—"সেই আবার? বহু আছে। তাদেরই মাইনে যোগাতে যোগাতে আমি সর্বস্বান্ত। কিন্তু মাইনেই যোগাই শুধু। কাজ পাই না কিছুই তাদের কাছে। আমার যদি অসীম ধৈর্য না থাকত, এ-ঝকমারির রাজাগিরি আমি একদণ্ডও করতে পারতাম না।"

"ধৈর্য থাকা সত্ত্বেও রাজাগিরি আপনাকে আর করতে হবেও না"—গম্ভীরভাবে বললেন কপিলেন্দ্র—"একদণ্ডের জন্যও না—"

"তার মানে? তার মানে?"—চেঁচিয়ে উঠল অনেকে।

মন্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন—"চণ্ডর দলের লোক। সেনাপতি, বন্দী করুন।"

ভদ্রসেন কিন্তুভাবে বললেন—"মহারাজেরও কি সেই আদেশ?"

কপিলেন্দ্র হঠাৎ ভদ্রসেনের কটি থেকে এক টানে তরোয়ালখানা কোষমুক্ত করে তুলে নিলেন নিজ হাতে—"আমার সহচর যারা আছ এখানে, তৈরী হও!"

সে যেন ভোজবাজি! চোখের পলকে আয়েসী সভাসদগুলির মধ্যে আদ্ধেক লোকই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, আর এক একখানা ভোজালি বসনের মধ্য থেকে বার করে বাকী আদ্ধেকের কণ্ঠ লক্ষ্য করে তা উঁচিয়ে ধরল।

"মহারাজ হিরণ্যবর্মা! সিংহাসনে বসবার বিড়ম্বনা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যই আমার আগমন আজ। কপিলেন্দ্রই আমার নাম, তবে আপনার চোখে ধুলো দেবার জন্য ডাকাত চণ্ড বলেও দিয়ে থাকি নিজের পরিচয়। কনৌজী ক্ষত্রিয়ই বটে জাত্যংশে, যদিও তিন পুরুষ বাস করছি—উৎকলেই।"

বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল শোনা গেল একটা। কপিলেন্দ্র বলে যাচ্ছেন—"ঐ যে আওয়াজ পাচ্ছেন, ও আমার সৈন্যদলের। এত কাল ওরা ডাকাতি করেছে, তবে গরিবের

উপরে নয়, স্বার্থসর্বস্ব ধনীর উপরে। হ্যাঁ, এতকাল ওরা করেছে ডাকাতি। না করে উপায় ছিল না। অর্থের দরকার ছিল এই বিপ্লবটা ঘটাবার জন্য। বিপ্লব ঘটে গেল যখন, এবার থেকে ওরা দেশরক্ষার কাজে ব্রতী হবে।"

পিলপিল করে কপিলেন্দ্রের সৈনিকেরা সভায় প্রবেশ করল। রাজা মন্ত্রী সেনাপতি সবাইকে ঘেরাও করে নিয়ে গেল প্রাসাদের অভ্যন্তরে। সেখান থেকে তাঁদের কাউকে আর কখনও বেরুতে দেখেনি কেউ।

সিংহাসনে বসলেন কপিলেন্দ্র সিংহ।

…তরোয়ালখানা কোষমুক্ত করে তুলে নিলেন নিজ হাতে। [পৃষ্ঠা ১৩৮

কাজ তাঁর অনেক। হিরণ্যবর্মার নামসর্বস্ব প্রশাসন অনেক কিছুর খবরই রাখেনি। বাহমনী সুলতান যে উৎকল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, রায়চুরে দোয়াবের অর্ধেকই যে বিজয়নগরের এলাকার ভিতর চলে গিয়েছে চুপি চুপি। বঙ্গদেশ থেকে যে মুসলমানী অভিযান রাঢ় অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে, তারা যে বর্ষাটা পেরুলেই মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে এই রাজ্য ঢুকে পড়বে, এসব কথা কেউ বলেনি হিরণ্যবর্মাকে। অবশ্য বললেও যে হিরণ্যবর্মা রুখতে পারতেন এসব, তা নয়। সে শক্তি তাঁর যৌবনে ছিল কিনা, সন্দেহ। এখন এই বার্ধক্যে যে তা নেই, সে তো সূর্যের মত স্বপ্রকাশ। নিজের সৈনিক তো বিশ হাজারের মত ছিলই কপিলেন্দ্রের। তা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী রয়েছে। এরা অবশ্য বেতন পায়নি দীর্ঘদিন ধরে। কর্তব্য কাজেই নিষ্ঠা ছিল না বিন্দুমাত্র। কপিলেন্দ্র প্রথমেই এদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করে দিলেন। মন্দিরের সুবর্ণভূষণ কেড়ে নিয়ে নয়, এ-যাবৎ যে অগাধ ঐশ্বর্য তিনি সঞ্চয় করেছেন ডাকাতি করে, তা থেকেই। সৈন্যেরা উল্লাসে উৎসাহে নব নরপতির জয়ধ্বনি করে উঠল। এ রাজার আদেশে তারা জীবন উৎসর্গ করবে।

সবচেয়ে জরুরী বাহমনী সুলতানকে নিরস্ত্র করা। সবচেয়ে মারমুখো শত্রু তিনিই। তাঁর আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসে বসে কালক্ষয় করা সমীচীন মনে হল না রাজার। আক্রমণই যে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, তা তিনি জানেন। বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তড়িৎ বেগে অভিযান চালিয়ে দিলেন বিদরের দিকে। ঐ নগরেই রাজধানী বাহমনি রাজ্যের।

বাহমনীরা চমৎকৃত। এ ব্যাপার অভূতপূর্ব। এ রাষ্ট্রের দীর্ঘ ইতিহাসে তাদের দেশের এত অভ্যন্তরে কোন শত্রু কোনদিন ঢুকে পড়তে পারেনি। "দিন দিন" রবে আকাশ কম্পিত করে তারা দেশরক্ষায় প্রস্তুত হল। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য সময় লাগে তো! সে-সময় তারা পাচ্ছে কোথায়? বিভিন্ন দুর্গ থেকে সৈন্য টেনে এনে রাজধানীর রক্ষার ব্যবস্থাকে দুর্ভেদ্য করে তোলার সুযোগ আর হল না তাদের। পর পর কয়েকটা ক্ষুদ্র প্রয়াস তারা করল বটে প্রতিরোধের, কিন্তু সে-সব চূর্ণ করে বিদরকে অবরুদ্ধ, বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে দীর্ঘদিন লাগল না কপিলেন্দ্রের।

বাহমনীদের চিরশত্রু বিজয়নগর দেখল যে দৈবানুগ্রহে একটা স্বর্ণ সুযোগ আপনা থেকেই এসে পড়েছে তার হাতে। কপিলেন্দ্রের সমর্থনে তারা যে এগিয়ে এল, তা নয়। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করে দুই একটা দুর্গ তারা কেড়ে নিল বাহমনীদের অধিকার থেকে। এতেই কাজ হল যথেষ্ট। বাহমনীদের আশঙ্কা হল—ভিতরে ভিতরে উৎকলে আর বিজয়নগরে সন্ধি হয়েছে বুঝি। তারা তখন ব্যস্ত হয়ে উঠল উৎকলী দুশমনটাকে যেভাবে হোক বিদায় করবার জন্য। সন্ধির প্রস্তাব আসতে দেরি হল না। উৎকলের খণ্ডগিরি পর্যন্ত ইতিপূর্বে বাহমনীদের যে-অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছিল, তা তারা প্রত্যাহার করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ কপিলেন্দ্রের করে গুনে দিল পাঁচ লক্ষ মোহর। বিজয়গর্বে বিদর থেকে পশ্চাদপসরণ করলেন কপিলেন্দ্র। বাহমনীরা হাঁফ ছেড়ে নিয়ে পূর্ণ মনোযোগে তৎপর হল বিজয়নগরকে রুখবার জন্য।

হঠাৎই উৎকলী বাহিনী দেশে চলে যাবে বিদর ছেড়ে, এটা ভাবতেই পারেনি বিজয়নগরীরা। তারা ধীরেসুস্থে অগ্রসর হচ্ছিল শত্রুরাজ্যের অভ্যন্তরে। এখন অবস্থাটা দাঁড়াল এই যে হয় তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হয় অচিরাৎ, নয় তো নিজের শক্তির উপরেই নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হয় মুখোমুখি যুদ্ধে। পালিয়ে আসা মর্যাদায় বাধল তাদের। যুদ্ধের পথই তারা বেছে নিল। অবশ্য বাহমনীর সঙ্গে যুদ্ধ তারা চিরদিনই করে আসছে, তাতে তারা ভয় পায় না।

পায় না ভয়, কিন্তু এবার যে পরিস্থিতিটা জটিল।

উৎকলের এই নতুন রাজা বাহমনী রাজ্যসীমা থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন, তা ঠিক, কিন্তু

নিজের রাজধানীতে ফিরে তো যাননি। না গিয়ে বরং তিনি বাহিনীর গতি ঘুরিয়ে দিয়েছেন রায়চুর দোয়াবের দিকে। ওদিকে একটা গোলমাল পাকিয়ে তোলাই কি উদ্দেশ্য তাঁর? আচ্ছা ফিচেল লোক তো এই ভূঁইফোঁড় রাজাটা।

অচিরেই কিন্তু সব সংশয়ের নিরসন হয়ে গেল বিজয়নগরের। কপিলেন্দ্রের দূত এল এই দাবি নিয়ে—রায়চুর দোয়াবের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল এতদিন অন্যায় করে নিজের দখলে রেখেছেন বিজয়নগরের অধিপতিরা, তা এক্ষুণি ফিরিয়ে দিতে হবে উৎকলকে, না দিলে এই পত্রকেই তাঁরা যুদ্ধঘোষণা বলে ধরে নিতে পারেন।

উভয় সংকট! নিজের বুদ্ধির ভুলকে বারবার ধিক্কার দিয়ে বিজয়নগরাধিপতি মেনে নিলেন কপিলেন্দ্রের দাবি। কারণ বাহমনীর কাছে হীনতা স্বীকার করা আত্মহননেরই নামান্তর হবে। বিন্দুমাত্র দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পেলেই মুসলমান সেনা ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজয়নগরী বাহিনীর উপরে।

অতঃপর বাহমনীতে বিজয়নগরে চলতে থাকুক যুদ্ধ, কপিলেন্দ্র দোয়াবের উপর উৎকলের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বিজয়গর্বে উৎকলে ফিরে গেলেন। বিদর থেকে পাওয়া পাঁচ লক্ষ মোহর দুঃস্থ প্রজাবর্গের ভিতর বিলিয়ে দেবে, এই তাঁর স্থির সংকল্প।

আজ উৎকল সিংহাসনে সগৌরবে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কপিলেন্দ্রদেব। এক প্রসন্ন প্রভাতে বঙ্গ থেকে এল সুলতানের দূত। উৎপলপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে অচ্ছেদ্য মৈত্রীবন্ধনের প্রস্তাব নিয়ে।

এত দিন পরে আবার বঙ্গসাগরের কূলে কূলে ধ্বনি উঠল—জয়তু কপিলেন্দ্রদেব উৎকলকেশরী!

করলে তোমরাও পার

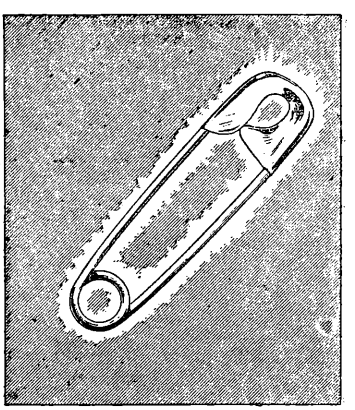

ছবিটা দেখলেই চিনতে পারা যায়। কিন্তু এটাও আবিষ্কার করা হয়েছে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াল্টার হান্ট নামে নিউইয়র্ক শহরের একটি লোক দুটি ছোট চিমটি আর কিছু সরু তার নিয়ে খেলা করতে করতে তিন ঘণ্টার মধ্যেই সেফটিপিন আবিষ্কার করে। তারপরই লোকটি তার আবিষ্কারের সত্ত্ব রেজেস্ট্রি করে প্রচুর অর্থোপার্জন করে। এত সোজা এত বহুল ব্যবহৃত দ্রব্য বোধহয় আজ অবধি আর কিছু বার হয়নি!

হাঁদা-ভোঁদার

শূন্যে ডিগবাজী

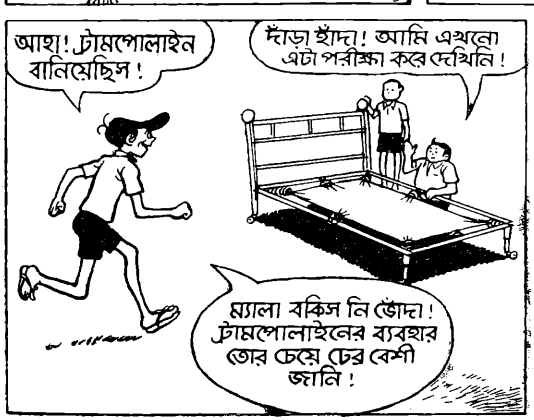

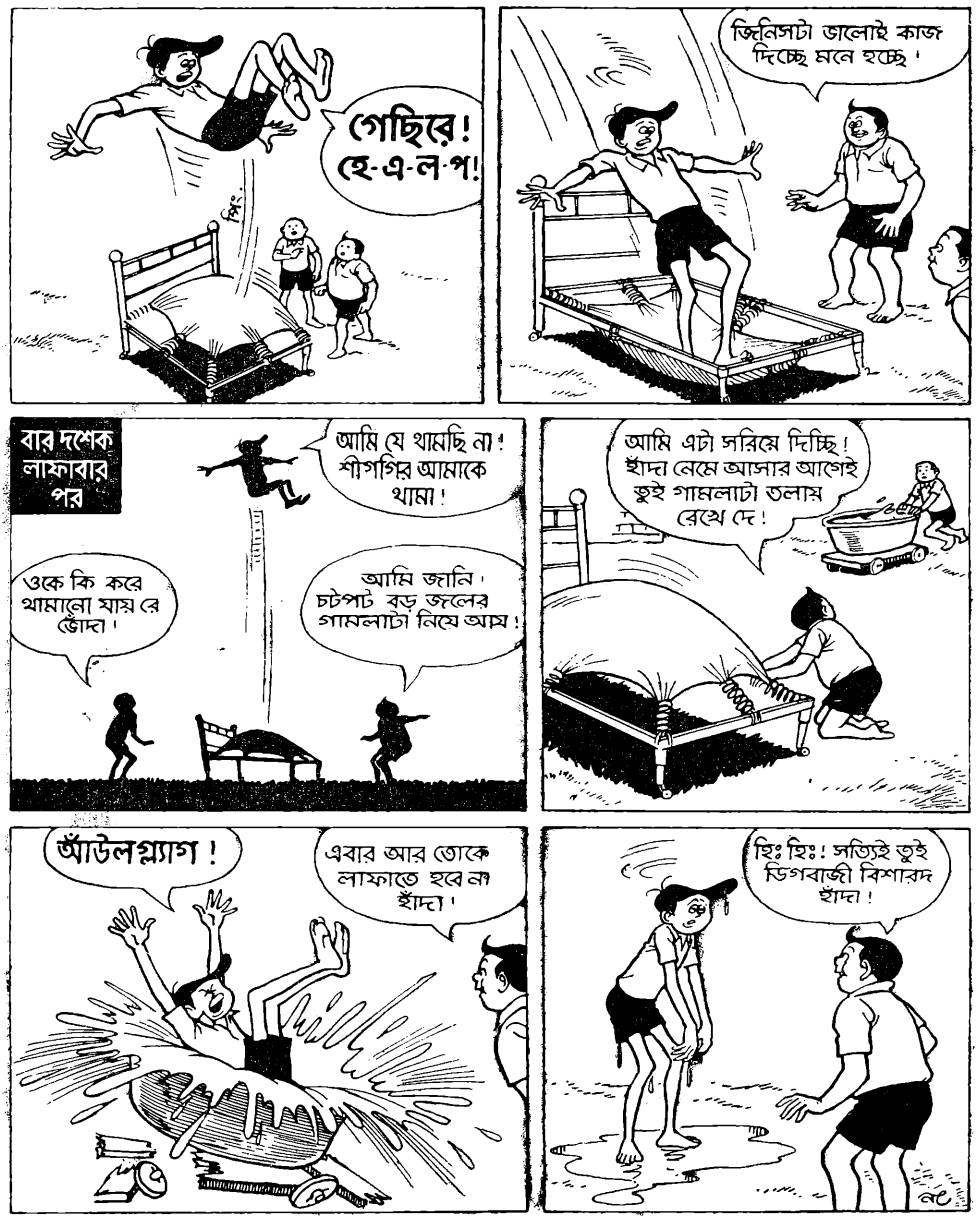
গেছিরে! হে-এ-ল-প!
জিনিসটা ভালোই কাজ দিচ্ছে মনে হচ্ছে।
বার দশেক লাফাবার পর
আমি যে থামছি না! শীগগির আমাকে থামা!
ওকে কি করে থামানো যায় রে ভোঁদা।
আমি জানি। চটপট বড় জলের গামলাটা নিয়ে আয়!
আমি এটা সরিয়ে দিচ্ছি! হাঁদা নেমে আসার আগেই তুই গামলাটা তলায় রেখে দে!
আঁউলগ্ল্যাগ!
এবার আর তোকে লাফাতে হবে না হাঁদা।
হিঃ হিঃ! সত্যিই তুই ডিগবাজী বিশারদ হাঁদা!

"৺বাসুদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

অপরাধী

সন্তোষকুমার মালাকার

প্রতিদিনের মত আজও ক্লাসে ঢুকলেন বঙ্কিমবাবু। ছাত্রেরা বলে—বঙ্কিমবাবুর নামের সঙ্গে চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কথাটা কিন্তু একটুও মিথ্যে নয়। বঙ্কিমবাবু তাঁর নামের মতই বাঁকা অর্থাৎ তাঁর পিঠের উপর একটা মস্তবড় কুঁজ রয়েছে যার জন্য তিনি হাঁটবার সময় বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

কিন্তু তাই বলে বঙ্কিমবাবুকে শিক্ষকতার অযোগ্য একথা তাঁকে কেউ বলতে পারবে না। বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক সর্ব বিষয়েই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তার জন্য স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন। এমন কি প্রধান শিক্ষক মহাশয় পর্যন্ত কোন কোন কাজে তাঁর পরামর্শ নেন।

শিক্ষক হিসাবে বঙ্কিমবাবু ঠিক তাঁর নামের উল্টো, অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত সোজা সরল মানুষ। তাঁর এই শিক্ষকতায় কেউ কোনরকম ত্রুটি খুঁজে পায়নি। তাঁকে কেউ কোনদিন কোন ছাত্রের গায়ে হাত দিতে দেখেনি। অবাধ্য ছেলেদের তিনি তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার দ্বারা বশীভূত করেছেন।

একদিন ক্লাসে ঢুকে বঙ্কিমবাবু যখন ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন হঠাৎ কথার মাঝে বাধা পড়ল। হঠাৎ একটি দলা পাকানো কাগজের মোড়ক টেবিলে এসে পড়তেই তাঁর মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। তিনি টেবিলের উপর থেকে কাগজের মোড়কটি হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে সেটি খুলে ফেললেন। খুলেই ভেতরে যা দেখলেন তাতে তিনি সাপ দেখার মত চমকে উঠলেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ যেন তাঁর দু-গালে সশব্দে দুটি চড় কষিয়ে দিল। দেখতে দেখতে বঙ্কিমবাবুর হাত দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। তাঁর চোখ দুটি অপমানে, জলে ভরে উঠলো। ঝাপসা হয়ে গেল তাঁর হাতের কাগজের লেখাগুলো। কাগজে লেখা ছিল, "কুঁজো বেঁকাবাবু, আমরা আপনার লেকচার শুনতে ক্লাসে আসিনি। আপনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান।"

বঙ্কিমবাবু আস্তে আস্তে ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রথম সারির ছাত্রেরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। সমস্ত ক্লাসটির উপর নেমে এল গভীর নিস্তব্ধতা।

মিনিট পাঁচেক পর স্বয়ং প্রধান শিক্ষক উমাপদবাবু ছুটে এলেন। তাঁর চোখ দিয়ে

যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। ছাত্রেরা উমাপদবাবুকে ক্লাসে ঢুকতে দেখে সকলে একটা ভীত চাহনি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। উমাপদবাবু সকলের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে দৃঢ় অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"হয়েছে হয়েছে, তোমরা যে আজ-কাল যথেষ্ট ভদ্রতা শিখেছ তা বুঝতে পেরেছি। এমন ভদ্রতা যার জন্য তোমাদের বাবার বয়সী পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়রা পর্যন্ত নিজেদের মানসম্মান হারাচ্ছেন। তোমরা আজই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিলে। যার কোন তুলনা হয় না, যার কোন ক্ষমা নেই। তোমরা হয়ত জান না যে সেই বঙ্কিমবাবুকে আমি এই স্কুলের হেডমাস্টার উমাপদ সান্যাল পর্যন্ত কত সম্মান করি কত মান্য করি। কিন্তু আজ তোমরা সেই বঙ্কিমবাবুকে অপমান করেছ। যে

—"শোন জয়, আমি অনেক ভেবে দেখলাম— [পৃষ্ঠা ১৪৬

হাত দিয়ে তোমরা ঐ কাগজখানা লিখেছ সে হাত তোমাদের একটুও কাঁপেনি? তোমরা আজ এমন ছাত্র হয়ে গিয়েছ, ছি ছি! এই কি তোমাদের ভদ্রতা? এই কি তোমাদের ব্যবহার।" এইটুকু বলে উমাপদবাবু একটু থামলেন। গোটা ক্লাস বাকরুদ্ধ ভাবে তাঁর কথা শুনে যেতে লাগল। উমাপদবাবু একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—"আজ তোমরা যথেষ্ট বড় হয়েছ, বুঝতে শিখেছ, ভালমন্দ বিচার করবার বুদ্ধি তোমাদের হয়েছে। তবু আজ, তোমাদের এ কি ব্যবহার? না না এ হতে পারে না। অবিলম্বে এর একটা প্রতিবিধান করা উচিত। আজ আমি এই অপরাধের যথাযথ শাস্তি দেব প্রকৃত অপরাধীকে। কে সেই অপরাধী? আমার সামনে এসে নিজের অপরাধ স্বীকার কর।"

ছাত্রের চুপ করে যে যার জায়গায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

উমাপদবাবু তাদের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন,—"এখনও বলছি অপরাধী নিজের

অপরাধ স্বীকার কর, নইলে তোমাদের সমস্ত ক্লাসকেই এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বল কে অপরাধী ?"

বলে উমাপদবাবু চুপ করলেন। কিন্তু তবুও ছাত্রদের মধ্যে কোন সাড় না পেয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেন—"বেশ, অপরাধী যখন নিজের অপরাধ স্বীকার করছ না তখন সমস্ত ক্লাসকেই শাস্তি পেতে হবে। শোন সকলে,—আমি এমন ব্যবস্থা করছি যাতে তোমরা সকলেই যেন তিন বছর পর্যন্ত কোন স্কুলে সুযোগ না পাও। এই স্কুল থেকেও তোমাদের নাম কেটে দেয়া হবে। মনে রেখো তোমরা আজ বঙ্কিমবাবুকে অপমান করে যে অপরাধ করেছ এ শাস্তি তার তুলনায় অনেক কম, বুঝেছ ?"

বলে হেডমাস্টার উমাপদবাবু আর দাঁড়ালেন না, বেরিয়ে গেলেন ক্লাসঘর থেকে।

এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে একটি ছাত্র দাঁড়িয়ে ডেকে উঠলো—"স্যার।"

ডাক শুনে উমাপদবাবু থমকে দাঁড়ালেন। ক্লাসের অন্যান্য ছাত্ররা তাদের 'বেস্ট বয়' জয়কে দাঁড়াতে দেখে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

জয় উমাপদবাবুর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললো,—"আমিই অপরাধী স্যার।"

জয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসঘরে যেন সশব্দে বজ্রপাত হল। সমস্ত ছাত্ররা এমন কি হেডমাস্টার উমাপদবাবু পর্যন্ত বিস্ময়ে এমন হতবাক্ হয়ে গেলেন যে—বেশ কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন জয়ের মুখের দিকে। যে মুখে নেই কোন অপরাধের কালিমা ; নেই কোন মিথ্যার প্রলেপ।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে উমাপদবাবু জয়ের দিকে এগিয়ে এসে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—"জয়, তুমি এই নীচ জঘন্য কাজ করেছ ? কিন্তু কেন করলে ?"

জয় মাথা নীচু করে বললো—"হ্যাঁ স্যার। কারণ বলতে পারব না।"

উমাপদবাবু বললেন,—"বেশ তোমাকে এই স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে এবং তিন বছরের জন্য তুমি কোন স্কুলেই সুযোগ পাবে না।"

বলেই হেডমাস্টার মহাশয় বড় বড় পা ফেলে ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর জয়কে দেখা গেল হেডমাস্টার মশাইয়ের অফিস ঘরের দিকে যেতে।

অফিস রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে জয় বললো,—"ভেতরে আসবো স্যার ?"

ভেতর থেকে আওয়াজ এলো,—"এসো।"

ভেতরে কেবলমাত্র হেডমাস্টার মশাই নিজের কাজ করছেন।

জয় উমাপদবাবুর কাছে গিয়ে বললো,—"আমায় ডেকেছেন কেন স্যার ?"

উমাপদবাবু নিজের কাজ রেখে জয়ের দিকে ফিরে বললেন,—"শোন জয়, আমি

অনেক ভেবে দেখলাম—আজ তোমাদের ক্লাসে যে ঘটনা ঘটেছে তা তোমার মত ছেলের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তুমি মেধাবী ছাত্র, পড়াশোনায় ভাল, অন্যান্য শিক্ষকরাও তোমার সুনাম করেন। বলেন—তোমার মত নম্র, বিনয়ী, ভদ্র ছাত্র খুবই কম দেখা যায়। কাজেই আমার মনে হয় এ কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে সত্যি করে বলো তো তুমিই ওই কাজ করেছ কিনা ?"

জয় হঠাৎ উমাপদবাবুকে গড় হয়ে প্রণাম করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো,—"মিথ্যে কথা বলেছি বলে ক্ষমা করবেন স্যার। সত্যিই আমি কাজটা করিনি। কে করেছে তাও জানি না। কিন্তু তবুও আমি মিথ্যে কথা বলেছি, বলতে বাধ্য হয়েছি। কারণ—আমার মত একটা ছেলের কোন ক্ষতি হলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু ক্লাসসুদ্ধ ছেলের কোন ক্ষতি হলে সে এক বিষম ব্যাপার। প্রকৃত অপরাধী যখন তার অপরাধ স্বীকার করছে না, তখন কেবলমাত্র তারই জন্য এতগুলো ছেলে শাস্তি পাবে তা হতে পারে না। কাজেই ওই সব ছেলেদের বাঁচাতে হলে যে কোন একটা ছেলের উচিত মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে অপরাধের কালিমা নিজের ঘাড়ে তুলে নেওয়া, আর সেই জন্যই আমি এই মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছি স্যার !"

উমাপদবাবুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি জয়কে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "কিন্তু জয়, এতে তোমার নিজের কত বড় ক্ষতি হত ভেবে দেখেছ ?"

জয় বললো,—"বুঝতে পারছি স্যার। কিন্তু এতগুলো ছেলের ক্ষতির কাছে আমার ক্ষতিকে বড় করে দেখলে চলবে না স্যার। এতগুলো ছেলের ক্ষতির কাছে আমার সে ক্ষতি অতি সামান্য।"

উমাপদবাবু জয়ের মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছেন আর ভাবছেন, 'কে এই ছেলেটি ? মানুষ না আরও কিছু ?'

হঠাৎ তাঁর ভাবনার অবসান ঘটিয়ে দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এলো—"আসতে পারি স্যার ?"

উমাপদবাবু দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন—"এসো।"

ভেতরে ঢুকলো জয়দেরই ক্লাসের একটি ছেলে। নাম শঙ্কর চক্রবর্তী। ঢুকেই শঙ্কর উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলো—"স্যার, অপরাধী আমি। জয় সম্পূর্ণ নির্দোষ। কাগজটা আমিই লিখেছিলাম এবং আমিই ছুড়েছি। আপনি আমার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখুন স্যার, জয় নির্দোষ। জয়কে শাস্তি দেবেন না। কথা বলুন স্যার, আমিই অপরাধী, শাস্তি আমায় দিন।"

উমাপদবাবু নিশ্চুপ। তিনি ভাবছেন, কেবলই ভাবছেন—'কে এই জয় সেনগুপ্ত ?

মানুষ না তারও উপরে আরও কিছু? যার সংস্পর্শে এসে—এই শঙ্কর চক্রবর্তী যে আজকের এই জঘন্যতম কাজের নায়ক, সেও তার অপকার্যের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ছুটে এসেছে আমারই কাছে, তার কুকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে।'

মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে তখনই তার মনে আসে অনুশোচনা। আর এই অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েই অপরাধী এসেছে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে। পরিণত হয়েছে পবিত্র মানবে……।

রংয়ের মজা

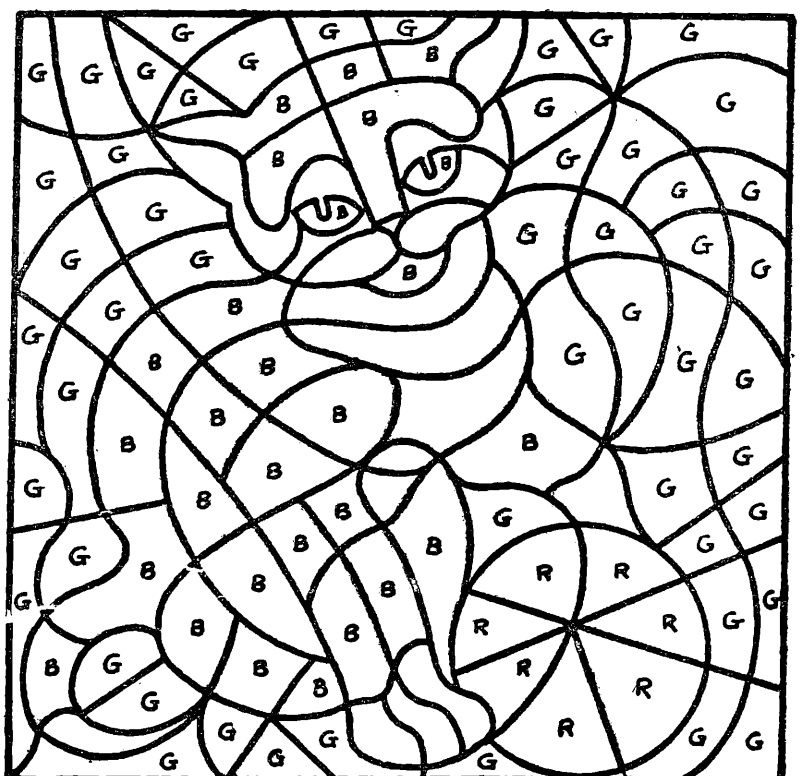

যে যে ঘরগুলিতে G লেখা সেগুলি সবুজ দিয়ে রং কর। যাতে R লেখা সেগুলি লাল দিয়ে রং কর। যাতে B লেখা সেগুলি কাল রং হবে। লেখা না থাকা ঘরগুলি সাদাই থাকবে। রং করে কি দেখছো বল তো—

"৺বাসুদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

বোবা

সঞ্চয়িতা কোলে

এক মাসের মধ্যে দু'বার বান এল। শ্রাবণের শেষে যখন প্রথম বান এল—ডুবে গেল দামোদরের পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ভেসে গেল অসংখ্য কুঁড়েঘর আর সদ্যকাটা পাট গাছের আঁটি। গ্রামের মানুষ তবুও মুষড়ে পড়ল না। কারণ তারা জানে এ তাদের বাৎসরিক ঘটনা। তিন দিনের মধ্যেই জল নেমে গেল। কিন্তু মাস না পেরোতেই আবার এল সর্বনাশা বান। তখনও বীজতলার জল শুকোয় নি, তাই নবীন আশাকে নতুন করে ভাঙবার সুযোগ হোল না। শুধু যে সব কাদামাটির বাড়িগুলো হাঁটু ভেঙে কোন রকমে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কোমর ভেঙে দিল; পথ-ঘাট-মাঠ একাকার করে দিল।

ধীরে ধীরে বানের জল শুকিয়ে গেল। চাষী বীজ ধানের জন্য অঞ্চলপ্রধান ও "বি. ডি. ও."র কাছে আর্জি জানাতে গেল। রাস্তা-ঘাট মেরামতের জন্য গ্রামের তরুণরা কোমর বাঁধল। স্টেট রিলিফ ও সরকারী লোনদানের ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্মচারীরা গ্রাম-পঞ্চায়েত সদস্যদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত। ভাদ্রের শেষে দামোদরের পশ্চিমের সব গ্রামগুলিতে তখন একই দৃশ্য। বেতাই, খোড়োপ, শেয়াগোড়, ভাটটিগরী, কাংরোল, শিবগেছে, মাখালপুর—যে দিকেই তাকান যায় সর্বত্রই একই রূপ।

কোলকাতা থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে ঝিংরে গ্রামটিও বন্যার কবল থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। এখানকার বাসিন্দারা অধিকাংশ শিক্ষিত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত। গ্রামে বাজার, ডাকখানা, ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, সিনেমা হল এবং শহরে যাতায়াতের জন্য পাকা সড়ক থাকায় চারিপাশের গ্রামবাসীরা এখানে এসে থাকেন। পাশাপাশি গ্রামের মজুররাও জীবিকার সন্ধানে এখানে আসে। গৃহনির্মাণ, রাস্তা-ঘাট মেরামত প্রভৃতি তাদের উপজীব্য। পর পর দুই দুইটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামের অধিকাংশ চাষী-মজুর পরিবার নিঃস্ব। পথ-ঘাট বিধ্বস্ত হওয়ায় বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পচে যাওয়া গাছপালা, কীটপতঙ্গের পূতিগন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত।

গ্রামের কালীতলায় প্রবীণ ও নবীনদের সমাবেশে অঞ্চলপ্রধান প্রতিটি গ্রামবাসী

ও ছাত্রছাত্রীকে গ্রামের এই দুর্দিনে সাহায্য করবার জন্য সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা ত্রাণকার্যে ব্রতী হল। গ্রামের স্কুলের শিক্ষক অষ্টবাবুর নেতৃত্বে ত্রাণকার্যের জন্য "রিলিফ-বণ্টন বিভাগ", "পথ-নির্মাণ বিভাগ", "রোগ-নিরাময় বিভাগ" প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ খোলা হল। শারীরিক যোগ্যতা অনুসারে তরুণ তরুণীদের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার নির্দেশ দিলেন।

আমি তখন দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের স্কুলসংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়টি ভেঙে পড়েছিল। আমার উপর ভার পড়ল এটির দেখাশুনা করা, এটিকে মেরামত করান। স্থির হল মূলতঃ শ্রমদানের ভিত্তিতেই মেরামতী কাজ সম্পন্ন হবে। গরিব মজুরদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক বা ডোল দেওয়া হবে। মেরামতী কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে—কারণ দুঃস্থ গ্রামবাসীদের রোগ নিরাময়ে এটাই একমাত্র ভরসাস্থল। তাছাড়া বন্যার পর কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি রোগ মহামারী রূপে দেখা দিতে পারে। এই সমস্ত রোগ প্রতিরোধের জন্যও চিকিৎসালয়টির একান্ত প্রয়োজন। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হলাম। গ্রামের অনেকেই সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু যাকে বাদ দিয়ে এ কাজ করা সম্ভব হত না, সে হল পাশের গ্রামের দুঃখীরাম ঘরামী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখে মনে হয় পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কোমর বাঁকা, টোল খাওয়া গাল, মাথায় টাক। সংসারে আপন বলতে তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। ঘর ছাওয়া পেশা হলেও সব রকম দিন-মজুরের কাজ করে। আমি তাকে দুঃখীকাকা বলে ডাকতাম। দুঃখীকাকার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় আট দিনের মধ্যে চিকিৎসালয়টি নূতনরূপ ধারণ করল।

কাল রবিবার। দাতব্য চিকিৎসালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় চালু হবে। গ্রামের তিনজন ডাক্তারই প্রত্যহ দু ঘণ্টা করে এখানে বিনা পারিশ্রমিকে রোগী দেখতে সম্মত হয়েছেন। আমার ডাক্তার জ্যাঠামশায় আরও রাজী হয়েছেন বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র গ্রামবাসীর বাড়িতে "জরুরী কেস" দেখতে যাবার জন্য। উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে এই সব আলোচনা হচ্ছিল। স্কুলের ছাত্রীরা চিকিৎসালয়টি সাজাতে ব্যস্ত। আলপনা আঁকা, আমপাতার ঝারি বাঁধা ইত্যাদি কতই না কাজ। আমি সকলকে আগামী কাল বেলা আটটার সময় আসতে বললাম। দুঃখীকাকাকে ডেকে বললাম, "দুঃখীকাকা, তুমি আমায় বিরাট দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন এখানে তোমার আর কোন কাজ নেই, তুমি বরং বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।" কিছুক্ষণ নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকার পর দুঃখীকাকা যেতে উদ্যোগ করল। "কাল আটটার আগেই আসা চাই কিন্তু!"—আমি বললাম।

সেদিন দুপুর থেকেই মাথা টিপটিপ করছিল। সন্ধ্যার আগেই কম্প দিয়ে জ্বর এল। লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়লাম। সন্ধ্যার পর কিছুটা সুস্থ হলে দেখলাম আমার চারিদিকে গুণমুগ্ধ ভক্তের দল বসে আছে। ডাক্তার জ্যাঠামশায় এসে আমায় পরীক্ষা করছেন —এমন সময় আধা খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে হ্যারিকেনের অল্প আলোয় এক চেনা মুখ ভেসে উঠল। ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে ডাক্তার জ্যাঠামশায় চলে গেলেন।

—"কে ? দুঃখীকাকা ?"

"কে রে দরজার কাছে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"ভিতরে আয়।"

"আঁজ্ঞে আমি, দিদিমণি",—বলে দুঃখীরাম ভিতরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

"কে ? দুঃখীকাকা ?"—আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "ভিতরে এস না—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?"

দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে জীর্ণশীর্ণ লোকটি ভিতরে প্রবেশ করে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমি এখনও বাড়ি যাওনি ? আজ তো তোমায় বেলা দুটোর আগেই ছুটি দিয়েছি", —আমি বললাম। "কাল আবার তাড়াতাড়ি আসতে হবে।"

"দুঃখীকাকা কাল একেবারে উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে তবে বাড়ি যাবে,"—আমার ভাই হাসতে হাসতে বলল। ওর কথা শুনে সকলে হেসে উঠল। আমি ভাইকে ধমক দিতে সকলে চুপ করল। দুঃখীকাকা একইভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমি কিছু বলবে দুঃখীকাকা ?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ,—আজ্ঞে না,"—উত্তর দিল দুঃখীকাকা। তারপর বলল,—"এখন কেমন বুঝছ দিদিমণি।"

"আমার জন্য ভেবো না। ডাক্তার জ্যাঠাবাবুর দু দাগ ওষুধ খেলেই ভাল হয়ে যাব। তুমি আর দেরি কোরো না। বাড়ি চলে যাও। কাল তাড়াতাড়ি আসা চাই কিন্তু!" আমি বললাম।

যেমন ধীরপদে ঢুকেছিল তেমন একইভাবে দুঃখীকাকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনাড়ম্বর পরিবেশ পরদিন চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন হল। আমার জ্বর না ছাড়ায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলাম না। দুপুরে ভাই ও বন্ধুদের মুখে অনুষ্ঠানের বর্ণনা শুনছি। আমাদের চাকর বিশ্বনাথ এসে বলল, "বড়দি, আজ সকালে দুঃখী খুড়োর পরিবার মারা গেছে।" আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তার কথা বিশ্বাস হল না। বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম দুঃখীকাকাকে সকালের অনুষ্ঠানে তারা কেউ দেখেনি। তখন বিশ্বনাথকে বললাম,—"তুই কার কাছে শুনলি এ কথা?"

"দুঃখীখুড়োর গাঁয়ের অনাথ বাগদী, সৎকারের জন্য বড়বাবুর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে। কাল বিকাল থেকে ভেদবমি শুরু হয়ে আজ সকালে দেহ রেখেছেন।" কথাগুলো একনিঃশ্বাসে বলে একটু দম নিল বিশ্বনাথ। তারপর আবার বলল, "বড়দি, তুমি যদি আর একদিন আগে ডাক্তারখানা সারিয়ে ফেলতে, তাহলে খুড়ীমা বেঁচে যেত।" আমি তখন ভাবছি কাল রাত্রে দুঃখীকাকা কি এইজন্যই আমার কাছে ছুটে এসেছিল? আমি কি তার নির্বাক্ মুখের ভাষা বুঝতে পারিনি?

* * * *

এখন আমি শহরে কলেজে পড়ি। যখনই নিভৃতে বসে গ্রামের কথা ভাবি মনে পড়ে দুঃখীকাকার মত মানুষদের, যারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কথাও বলতে পারে না। গ্রামবাসীদের সেবা করার আত্মপ্রসাদ দূর হয়ে গেছে, কারণ আমি তো একজন গ্রামবাসীরও নির্বাক্ মুখে ভাষা দেবার জন্য কোন শিক্ষারই আয়োজন করিনি।

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১। ১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯

১ হইতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি উপরে সাজান আছে। এইভাবে সাজানর ফলে পাশাপাশি সারিতে প্রতিটি সংখ্যা তার ঠিক বাঁ পাশের সংখ্যার চেয়ে বড়। এবং উপর নীচ সারিতে উপরের সংখ্যার চেয়ে নীচের সংখ্যাটি বড়। ঠিক এই নিয়মে ঐ নয়টি সংখ্যাকে তোমরা আরও কয়রকমভাবে সাজাতে পার জানাও। অর্থাৎ পাশাপাশি সারিতে বাঁপাশের সংখ্যাটি অপেক্ষা ডানদিকের সংখ্যাটি বড় এবং উপর নীচ সারিতে উপরের সংখ্যা অপেক্ষা নীচের সংখ্যাটি বড় থাকবে।

২। একশো থেকে বাদ দিয়ে এক লেখ এমনভাবে,
যার বাদ দিলে শেষ সকললোকে চক্ষু খুলে দেখতে পাবে।

—শিল্পী রায়, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

গত মাঘ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। ১ ২ ৩ ১ ২ ৬ ৫ ৩ ১ ২
৬ ৫ ৩ ১ ২ ৪ ৮ ৭ ১ ২
৪ ৮ ৭ ৪ ৫ ৬ এইভাবে কমপক্ষে ২৬ বার সরাতে হবে।

২। চাপাটি

গত মাঘ সংখ্যার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—সজল মজুমদার ও দেবজ্যোতি মিত্র—রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট; জয়দীপ ঘোষ দস্তিদার—সিংহী-বাগান; টুটুল, রানা, টুম্পা, বাপী ও পিউ—রানী হর্ষমুখী রোড; খোকন, তোতন, ছোটন, মুনমুন ও পিংকীরানী—যোধপুর পার্ক।

ছাওড়া—নিতাইচন্দ্র বেতাল ও গৌতম ভৌমিক—ফালিটি করা; মিতা ও বাবা—হাওড়া-৩; মন্দিরা, অসিত ও অমিত দত্ত—কাসুন্দিয়া; মা, বাবা, দেবাশীষ ও শুভ্রা চক্রবর্তী—শিবপুর।

হুগলী—বাবু, কণা ও টুটুন—রিষড়া।

বর্ধমান—সঞ্জয় ও শুভেন্দু—রূপনারায়ণপুর; জ্ঞান, বুলা খুকু, দেবু, বাপি, দিলীপ, দীপা, বুবুন ও রাজা রাউৎ—বর্ধমান।

পুরুলিয়া—মন্টু, চম্পু, মধু, হেবলো ও দাদা—আনারা; রূপেন, দিলীপ, ধনঞ্জয়, ঈশান, মানিক, প্রতিমা ও মলিনা—পুরিয়ারা।

বাঁকুড়া—উমা, নোটন ও স্বপন মুখার্জী—খাতরা।

বিহার—ইতু, মঞ্জু ও অঞ্জু চট্টোরাজ—জামসেদপুর-৩; দীপা রায় ও শিখা বসু—লালপুরচক; মিতা, জয়ন্ত ও কবিতা—মুনিডিহ কলিয়ারী; বাবা, মা, দিদি, বরুণ, শেখর ও ভাস্কর দাশ—চক্রধরপুর।

উত্তরপ্রদেশ—শুভেন, সুতপা, সুদীপা, সৌমেন ও সিতেন সাহারায়—আরমাপুর।

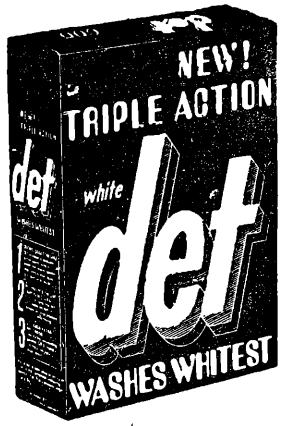

নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট

- নতুন ডেট একটি খুব সাদা পাউডার··· যাতে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।
- নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লাও দূর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।
- নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ···তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।

৫টি নতুন সাইজে পাবেন : ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০
তাছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে—নীল ডেট

Shilpi-HPMA 61F/71 Ben

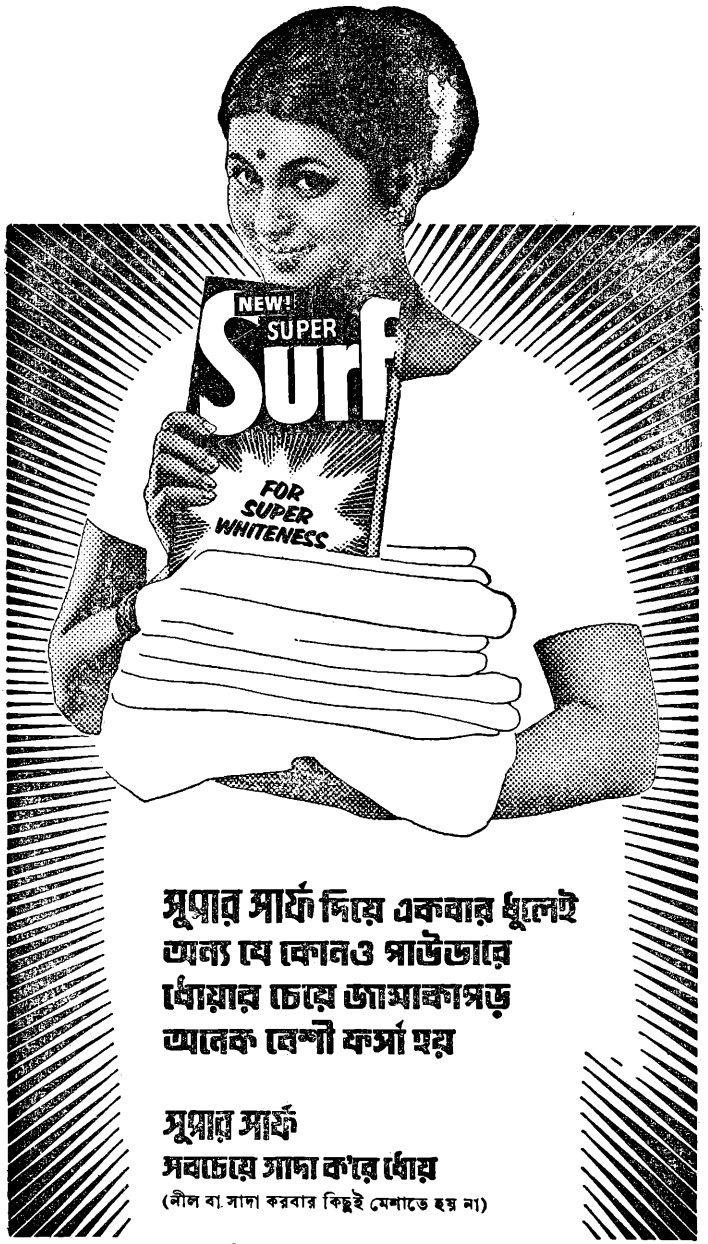

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SU.117-77 BG

রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বাড়িয়ে তোলে আর স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের জন্যে দরকার বিশেষ ধরনের পুষ্টি—প্রয়োজন **'হরলিক্‌স'**। কারণ, **'হরলিকস'** মা ও গর্ভস্থ শিশুকে যোগায় বাড়তি শক্তি ও শরীর গঠনকারী প্রোটীন। এটি হজম করাও খুব সহজ।

তাই তো ডাক্তাররা গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর **'হরলিক্‌স'** খেতে বলেন আর আজ প্রায় ১০০ বছর ধরে এই পরামর্শই দিয়ে আসছেন।

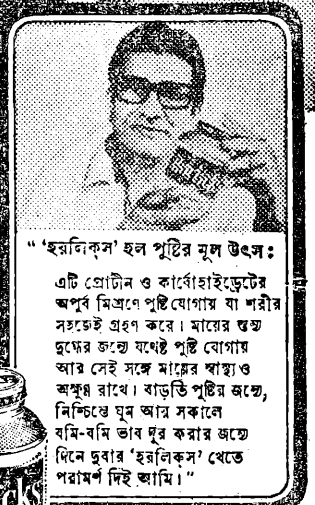

" 'হরলিক্‌স' হল পুষ্টির মূল উৎস:

এটি প্রোটীন ও কার্বোহাইড্রেটের অপূর্ব মিশ্রণে পুষ্টি যোগায় যা শরীর সহজেই গ্রহণ করে। মায়ের স্তন্য দুগ্ধের জন্যে যথেষ্ট পুষ্টি যোগায় আর সেই সঙ্গে মায়ের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ রাখে। বাড়তি পুষ্টির জন্যে, নিশ্চিন্তে ঘুম আর সকালে বমি-বমি ভাব দূর করার জন্যে দিনে দুবার 'হরলিক্‌স' খেতে পরামর্শ দিই আমি। "

'হরলিক্‌স'—

পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

'হরলিক্‌স'·
রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL-5599A

আশুতোষ দেব প্রণীত

নবপর্যায় সংস্করণ

গণিতাংশের সমাধান সংবলিত

কিশলয়-বোধিকা

প্রথম ভাগ কিশলয়-বোধিকা (তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য)
মূল্য—১·২৫

দ্বিতীয় ভাগ কিশলয়-বোধিকা (চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)
মূল্য—১·৭৫

তৃতীয় ভাগ কিশলয়-বোধিকা (পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য)
মূল্য—২·২৫

Complete Key to

PEACOCK ENGLISH

Primer and Readers

Notes on

The Peacock English Primer
(for Class III) Price Re. 1/-

The Peacock English Readers
Book I (for Class IV) Price Rs. 1·50

The Peacock English Readers
Book II (for Class V) Price Rs. 1·75

মধুসূদন দেব প্রণীত

ছাত্রসাথী
(তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
মূল্য—৩·৫০

আধুনিক ছাত্র-সুহৃদ্
(চতুর্থ শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
মূল্য— ৫·০০

প্রশ্নোত্তরিকা
(পঞ্চম শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
মূল্য—৫·০০

দেব সাহিত্য কুটীর :: ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

by A. T. DEV

NOTES ON
SELECTIONS FROM ENGLISH
PROSE
(For SCHOOL FINAL STUDENTS)
Class X

NOTES ON
SELECTIONS FROM ENGLISH
VERESE
(For SCHOOL FINAL STUDENTS)
Class X

NOTES ON
THE PIECES FOR
NON-DETAILED STUDY
For, Class IX, X & XI

NOTES ON
পাঠ-সংকলন (দ্বিতীয় খণ্ড)
(পদ্যাংশ ও গদ্যাংশ)
for Class XI H. S.

NOTES ON
পাঠ-সংকলন (প্রথম খণ্ড)
(পদ্য ও গদ্য)
IX & X for S. F. & H. S.

NOTES ON
ENGLISH SELECTIONS
(PROSE & VERSE)
for Class IX S. F. & H. S.

NOTES ON
ENGLISH SELECTIONS
(PROSE & VERSE)
X & XI for H. S. Students

NOTES ON
সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহ
(গদ্য)
IX & X for S. F. & H. S.

NOTES ON
সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহ
(পদ্য)
IX & X for S. F. & H. S.

দেব সাহিত্য কুটীর ● ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯